নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্নরায়চৌধুরী সম্পাদিত।

ষড়্‌বিংশ খণ্ড—১৩১৫।

কলিকাতা,
২১০/৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

ষড়বিংশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী।

মৌনীবাবা।

সূচনা।

স্বভাবসাধু, আজন্ম বৈরাগী, আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনে অনিচ্ছুক, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা মৌনীবাবা চিরদিন আপনাকে একান্তে মানব চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন প্রদর্শন-প্রবৃত্তি-বিহীন মানুষকে আমরা কিরূপে প্রকাশ করিব? তাঁহার কোন গুণ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি অসম্ভব, বরং সে মহৎ জীবনের অসাধারণ বৈরাগ্য, ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, গভীর ঈশ্বরানুরাগ সম্যকরূপে প্রকাশ করিবার সুযোগ এবং সামর্থ্য নাই, ইহাই একান্ত ক্ষোভের বিষয়। যে মহাসাধনার জন্য সে জীবন এ সংসারে প্রেরিত হইয়াছিল, অতি শৈশব কাল হইতেই তাহার বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলে মোহিত হইতেন। ক্রীড়াশীল অন্যান্য সঙ্গীগণ যখন উদ্দাম আনন্দে অভিভূত হইয়া নানা প্রকার ক্রীড়ায় মত্ত থাকিত, এই শিশু-সাধু তখন একান্তে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন; কোন প্রকার আমোদে যোগ দিতেন না। উত্তরকালে ওঁকারনাথ পর্ব্বতে জীবনের শেষ পঞ্চবর্ষ কাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া জীবনের অভীষ্ট লাভে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। জীবনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে একই ভাব, একই উদ্দেশ্য, একই সাধন সে জীবনের বিশেষত্ব ঘোষণা করিতেছে।

মৌনীবাবা* আশৈশব নির্ম্মল চরিত্র এবং আমরণ পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে একটী অসত্য কথা কহিয়াছেন বা কাহারও মনে ব্যথা দিয়াছেন, ইহা কেহ জ্ঞাত নহেন। আজীবন সর্ব্বজনপ্রিয় এবং ভগবানে সমর্পিত-চিত্ত থাকিয়া উন্নততর লোকে নীত হইয়াছেন। এমন সাধু-চরিত্র প্রকাশ করিলেও পুণ্য, পাঠ করিলেও পুণ্য। এই জন্য আজ অযোগ্য-হস্তে, ভক্তিনতশিরে যথাসাধ্য সেই পূতচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শৈশব।

দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৬৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আজুদিয়া গ্রামে এক ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে সাধু প্যারীলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভক্ত শিবনাথ ঘোষ মহাশয় বাল্যকাল হইতে বিশুদ্ধ বৈরাগ্য-প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনের কথা আমাদের সবিশেষ জানা নাই, দুই একটী মাত্র ঘটনা জানা গিয়াছে।

শিবনাথের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহাদের বাসগ্রামে এক সন্ন্যাসী আগমন করেন। শিবনাথ তাঁহার সঙ্গ লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবেন স্থির করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি ভিক্ষা করেন। জ্যেষ্ঠ ইহাতে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু বালক শিবনাথের বিষয়-বিমুখ হৃদয় ইহাতে সম্মত হইল না। জ্যেষ্ঠ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"যদি বিষয়কর্ম্মে মন না দাও, তবে বিষয়ের এক কপর্দ্দকও পাইবে না—ইহা লিখিয়া দিয়া যাও।" শিবনাথ জ্যেষ্ঠের

* সাধু প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় মধ্যভারতে 'মৌনীবাবা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইচ্ছানুরূপ লিখিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে তিনি অবিষয়ী হইলেন।

তিন বৎসর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবার সময় শিবনাথ আজুদিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এক লক্ষপতির গৃহে তিনি অতিথি হইলেন। এই সরল সাধু যুবককে দেখিয়া গৃহকর্ত্তার অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা হইল। তিনি তাঁহাকে গৃহী হইতে অনুরোধ করিলেন। যুবক বলিলেন, বিষয়কর্ম্মে তাঁহার স্পৃহা নাই, মুক্তভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেই তিনি উৎসুক। গৃহকর্ত্তা বলিলেন—"আমার তিন পুত্র, তুমি চতুর্থ পুত্র হইলে। আমার একমাত্র কন্যাকে তুমি বিবাহ কর—এই আমার ইচ্ছা। তোমাকে বিষয়কর্ম্ম কিছুই করিতে হইবে না।"

ধনীর একমাত্র আদরের দুহিতা। তৎকালীন প্রথা অনুসারে অতি শৈশবে তিনি কন্যার বিবাহ দেন নাই। দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই কন্যা পরম যত্নে পিতার গৃহে প্রতিপালিতা হইতেছিলেন। সৌন্দর্য্য এবং সুশীলতার এই কন্যা সর্ব্বজন প্রশংসিত ছিলেন। সুতরাং শিবনাথ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সহজেই সম্মত হইলেন। বিবাহ করিয়া তিনি অধিকাংশ সময় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; বিষয় কর্ম্মের ধার ধারিতেন না। শেষ জীবনে কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম দেখিতে হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিবনাথ পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। চিরজীবন তিনি এক নিয়মে যাপন করিয়াছেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি স্নান করিতেন, তাহার পর তিন চারি ঘণ্টা কাল পূজাহ্নিকে কাটাইতেন। পূজান্তে নিজেই নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন। এই সময়ে শিশু প্যারীলাল সময় সময় পিতার নৃত্যগীতে যোগদান করিতেন।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামান্তে গীতা, চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেন। এই সময়ে গৃহের ও পল্লীর অনেক মহিলা ও পুরুষগণ আসিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেন। সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ আবার নৃত্যকীর্ত্তনে মত্ত হইতেন। ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল।

শিবনাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি হইত। তিনি কখনও দেবীর পূজা দর্শন বা প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। ভক্ত বৈষ্ণবগণ জাতিভেদের কঠোরতা গ্রাহ্য করেন না। শিবনাথ এ সম্বন্ধে বড় উদাসীন ছিলেন। বাড়ীর মুসলমান ভৃত্যের উপর কেহ কোন রকমে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন, বলিতেন—"কৃষ্ণের জীব, সকলেই সমান।"

পুত্রেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক সময় আলোচনা হইত। তিনি বলিতেন—"ঈশ্বর নিরাকারও সাকারও। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভক্তের হৃদয়ে দেখা দিতে পারেন। আমি চোক বুজিলেই, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী আমার আরাধ্যকে দেখিতে পাই। তোমরা তাঁকে নিরাকার ব'লে বুঝেছ, সেই ভাবেই তাঁর পূজা কর। যে যে ভাবে তাঁকে পূজা করে, সেই ভাবেই তাঁকে পায়। যার তার খাওয়াটা লোকাচার বিরুদ্ধ। আমাদের ধর্ম্মে বলে—'লোকের কাছে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার,

সমসাধকদের সঙ্গে অবিচারে, আহারাদি নিষেধ নাই,—কিন্তু সে সঙ্গোপনে। নতুবা, সমাজের বন্ধন থাকেনা; সমাজ গেলে ধর্ম্ম দাঁড়ায় কোথায়?"

শেষ জীবনে, প্যারীলাল সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ঠিক, ঠিক, আমার যা আগেই করা উচিত ছিল, প্যারী তাহা করিয়া আমাকে বড় লজ্জা দিয়াছে।" এই বলিয়া, ভারতের পুণ্যতীর্থ সমূহ পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছায় সেই যে ভক্ত শিবনাথ গৃহ ছাড়িলেন, আর ফিরিলেন না। আজ পঞ্চদশ বর্ষ কালের বক্ষে লুকাইয়াছে,—শিবনাথ নিরুদ্দেশ। আজ তিনি এ লোকে কিম্বা লোকান্তরে, তাহা আমরা জানি না।

এই পিতার পুত্র হইয়াই সাধু প্যারীলাল স্বভাব-সাধু হইয়াছিলেন।

প্যারীলালের মাতা নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা, সহিষ্ণুতা, কোমলতা, নির্ম্মল ও আড়ম্বরশূন্য ধর্ম্মভাবে ভূষিতা। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারকে তিনি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। আজীবন ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে বাস, কিন্তু সে-পরিবারে অশান্তি নাই। ভ্রাতৃবধূরা চিরদিন তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ উদারতা। পুত্রদিগের ধর্ম্মকে তিনি অত্যন্ত পবিত্র মনে করিয়া শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার পুত্রেরা যখন উপাসনা এবং ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন, তিনি অতি ভক্তির সহিত তাহাতে যোগ দিতেন এবং এখনও দেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যখন তাঁহার এক বালিকা কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ লুকাইয়া কলিকাতায় লইয়া আসেন, তখন তিনি কন্যাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রবিবার; মন্দিরে উপাসনা হইতেছিল। তিনি মন্দিরের উপাসনায় গেলেন;—নিরাশ-মনে ফিরিয়া আসিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন—"বাবা, তুই আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিস্।" পুত্র বলিলেন—"কেন, মা?"

মাতা বলিলেন—"তোর কথায় আমি বুঝেছিলাম যে, ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা দেবী; ধর্ম্মের জন্যই তাঁদের সব। দেখে তো তা মনে হ'ল না। এত বিলাসিতার মধ্যে যে প্রেম, ভক্তি আসতে পারে, তা তো মনে হয় না। কুমুদিনীকে যদি সত্যিই ধর্ম্মের জন্য এনে থাকিস্, তা'হ'লে রাখ; আর যদি এই রকম বিবি তৈ'রী করিস্, তবে ফিরিয়ে দে—আমি নিয়ে যাই।"

তিনিও জাতিভেদের কথা মানেন না। পুত্রদের বন্ধুগণ বাড়ীতে আসিলে, তিনি সকলকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে একত্রে আহার করাইতেন, কখনও জাতির বিচার করিতেন না। ইহাতে প্যারীলালের পিতাও আপত্তি করিতেন না; বরং দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

প্যারীলালের মাতার অসাধারণ সহিষ্ণুতা। পতি সর্ব্বত্যাগী নিরুদ্দেশ, পুত্রেরা গৃহত্যাগী, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন দিন অনুযোগ শোনা যায় নাই। পতিপুত্র ধর্ম্মের জন্য সব ছাড়িয়াছেন—ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা। গতপূর্ব্ব বৎসর যখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যে বস্তুর জন্য সংসার ছারখার করলে, এত দুঃখ দিলে—বল তা' পেয়েছ কিনা?" আরো

বলিয়াছিলেন—"কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি নাই, পাছে তোদের অকল্যাণ হয়। ভগবান তোদের ভালই করবেন। তাঁকে লাভ করতে পারবি—নিশ্চয় পারবি।"

এই মাতার প্রভাবে প্যারীলালের ধর্ম্মজীবন শিশুকালেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই পুণ্যবতী নারী এখনও জীবিত আছেন।

প্যারীলাল, পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁহারা দুই ভ্রাতা ও পাঁচ ভগিনী। প্যারীলাল ব্যতীত সকলেই জীবিত আছেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, আড়ুদিয়া গ্রামের ও তৎকাল-প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশের বর্ত্তমান হীনাবস্থা ছিল না। বিশালকায়া পদ্মা নদী গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিতা। গ্রামের ধনী-দরিদ্র সকলের দিন সুখে কাটিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। পল্লীমাতার এই শান্তক্রোড়ে প্যারীলালের শিশুজীবন কাটিয়াছিল।

শিক্ষা।

প্যারীলালের গ্রাম্য-পাঠশালাতে শিক্ষারম্ভ হয়। পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি চারি মাইল দূরবর্ত্তী ছাত্রবৃত্তি-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে যান। তাঁহাকে প্রতিদিন এই দীর্ঘপথ হাঁটিয়া যাওয়া আসা করিতে হইত। তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া তিনি বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে, পঞ্চম বর্ষীয়া এক বালিকার সহিত প্যারীলালের বিবাহ হয়। এই বাল্যবিবাহ তাঁহার জীবনে কু-ফল আনয়ন করিয়াছিল।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া তিনি পাবনা জেলা-স্কুলে পড়িতে যান। এই স্থানেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এই সময়ে প্যারীলালের এক অদ্ভুত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি সেই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক। লোকে ইঁহাকে 'খ্রীষ্টান' বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু ইনি ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বাহিরের একখানি জীর্ণঘর ইঁহার আশ্রয়স্থান ছিল। মেথর-জাতীয়া এক রমণী ইঁহাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইত। অপরে ঘৃণা করিলে কি হয়, ইঁহার কথাবার্ত্তা, চলাফেরার মধ্যে এমন একটী তন্ময় ভাব ছিল যে স্বভাবসাধু প্যারীলাল শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি মাঝে মাঝে ইঁহার নিকটে যাইতে আরম্ভ করিলেন। শিশুকালে পিতার নিকট শুনিয়াছিলেন—"কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই; কৃষ্ণের জীব সকলেই সমান," —ইঁহার জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলেন, রোগ-শয্যায় কষ্ট পাইলে পিতা বলিতেন—"হরিকে ডাক, সব কষ্ট যাবে,' —দেখিলেন ইনিও সর্ব্বদাই প্রার্থনার ভাবে থাকেন ও ধর্ম্মকথা কহেন। এমন মানুষ তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই; সুতরাং একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইনি কয়েকখানি ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তক ও একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত দিলেন, নিত্য প্রার্থনা করিতে বলিয়া দিলেন। প্যারীলাল প্রতিদিন গান ও প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই হইতে প্রার্থনা তাঁহার জীবনের সাথী হইল, ইহজীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ইহাকে সঙ্গচ্যুত করেন নাই।

বাল্যকালের ঐকান্তিকতা। যাহা শুনিতেন তাহা তখনই কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। একদিন গুরু উপদেশ দিলেন—"লোকে বলে যার তার খাওয়া তো ধর্ম্ম নয়; ঘরে বসে ঈশ্বরের নাম

কর, ভাল মানুষ হও, তাহাতেই ধর্ম্ম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,—মুসলমানের ভাত খাওয়া ধর্ম্ম;—ইহাতে নিজের ও অপরের কুসংস্কার যায়। আমরা যে মুখে বলি—'সকলেই আমাদের ভাই'—কাজেও তাই করা চাই। সুতরাং তোমরা সকল জাতির অন্ন অবিচারে গ্রহণ করিবে, তাহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইবে।"

উপদেশ শ্রবণমাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করা। ক্লাসে একটী মুসলমান বন্ধু পড়িতেন, তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া পিষ্টকাদি খাইয়া আসিলেন ও মুসলমানের পাঁউরুটি কিনিয়া খাইলেন এবং ইহা ধর্ম্মভাবে করিলেন—হাল্‌কা ভাবে নহে।

ছুটীর সময় বাড়ীতে যাইয়া সঙ্গীত ও উপাসনা করিতেন। পিতা, পুত্রদের মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া খুব সুখী হইতেন। ভক্তির গান ও ধর্ম্মকথা শুনিয়া ভক্ত পুত্রদের শত অপরাধ ভুলিয়া যাইতেন।

পাবনায় প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্যারীলাল রাজসাহী কলেজে পড়িতে যান। এই স্থানে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হইল না, শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ী ও পরে (রংপুর) সপ্তপুষ্করিণী গমন করেন। এই স্থানেই তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের সূত্রপাত; তাঁহার একমাত্র কন্যা এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। প্যারীলালের গার্হস্থ্যজীবন নানা পরীক্ষায় পূর্ণ ছিল। বার বৎসর বয়সে, পাঁচ বৎসরের এক শিশু-বধূর সহিত পিতা বিবাহ-সূত্রে তাঁহাকে বাঁধিয়া দেন। এই বালিকা-বধূকে কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা করিবার জন্য প্যারী-লালের শত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বধূ কিছুতেই পুস্তক স্পর্শ করিতেন না। এই পত্নীকে ধর্ম্ম-পত্নী করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ করি, তাঁহার সে বাসনাও পূর্ণ হয় নাই।

পরীক্ষা।

কন্যার বয়স পাঁচ ছয় মাস হইলে পিতামহ পিতামহী তাহার অন্নপ্রাশনের আয়োজন করিলেন। প্যারীলাল তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বলিলেন কন্যার অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ব্রাহ্মমতে হইবে। পিতামাতা বলিলেন—"সেতো বেশ! তোমরা ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে ভগবানের নাম করে কন্যার নাম দিবে, ইহাতে আপত্তির তো কোন কারণ নাই। তোমাদের বন্ধুরা যিনি যেখানে আছেন, তাঁদের ডাক।"

কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে ধর্ম্মবন্ধুরা আসিলেন; হিন্দুসমাজের আত্মীয়-কুটুম্বও সকলে আসিলেন। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কন্যার নামকরণ হইল।

উপাসনান্তে আহারের সময় এক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ অঞ্চলের অনাচরণীয় দুই ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই সামাজিক ব্যাপারে লোকাচার পালন করিতে হইবে; সুতরাং পুত্রেরা উঁহাদের সহিত একত্রে আহার করিতে পারেন না। পিতা বলিলেন—"এক্ষেত্রে একত্রে আহার হইতে পারে না।" কিন্তু পুত্রগণ বলিলেন—"যে সকল ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই একত্র পান ভোজন হয়, আজ তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে ভোজন না করিলে কপটতা হইবে।"

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল—আহারের ডাক পড়ে না। হিন্দু সমাজের বন্ধুগণ অনেকেই আহার করিয়া চলিয়া গেলেন; ব্রাহ্ম-

বন্ধুগণ আলোচনা, সংকীর্ত্তনাদি করিতেছেন;—সকলেই অভুক্ত। শুভদিনে এই অকল্যাণ-চিহ্নে সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

বেলা শেষে স্থির হইল, নিকট-গ্রামবাসী এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ীতে আহারের আয়োজন হইবে; রাত্রিতে সকলে সেখানে আহার করিবেন।

প্যারীলালের মাতা ইহা শুনিলেন, দেখিলেন গৃহ হইতে অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি সমাজিক বন্ধন তুচ্ছ করিয়া, সকলের সমক্ষে আসিয়া বলিলেন—"আপনারা আমার পুত্রস্থানীয়। আমি আপনাদিগকে একত্রে আহার করাইব; আপনারা অভুক্ত অবস্থায় ফিরিবেন না।"

মাতা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে একত্রে আহার করাইলেন। সেই দিন প্যারীলাল পিতাকর্ত্তৃক বন্ধুগণসহ লাঞ্ছিত হইয়া গৃহতাড়িত হইলেন।

তাঁহার হৃদয় অতিশয় স্নেহ-প্রবণ ছিল। পিতামাতা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী সন্তান, এমন কি দূরসম্পর্কিত আত্মীয়গণের প্রতিও তাঁহার ভালবাসা অতি গভীর ছিল। কাহারও দুঃখ সহিতে পারিতেন না,—কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এমন কোমল হৃদয়েই পবিত্র বৈরাগ্য অবতীর্ণ হয়। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে এ ঘটনা বিরল নহে। পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, একদিকে যেমন তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় শতধা ভাঙ্গিয়া গেল, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য সেই আহত হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া, পরম পিতাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই সময়ে তিনি প্রায়ই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন—"আমাকে তোমরা বিদায় দাও, আমাকে নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধন করিবার সুযোগ দাও।" ঈশ্বর সে সুযোগ করিয়া দিলেন।

কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইল। ইহাতে তাঁহার আহত হৃদয় আরও ব্যথিত হইয়া উঠিল, তাঁহার সংসার-বিমুখতা বৃদ্ধি পাইল।

পত্নী-বিয়োগের পর, প্যারীলাল কার্য্য-স্থান হইতে দু'মাসের বিদায় লইয়া কলিকাতা আসিলেন। ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে নানাস্থানে গমন করিতেছিলেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, প্যারীলাল তেমনি তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া গেলেন। তৎপরে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বাগআঁচড়া গ্রামবাসী ব্রাহ্মদের হীনাবস্থার কথা শুনিয়া তিনি সেস্থানে গমন করিলেন এবং বালক বালিকাদের জন্য একটি মাইনর বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হৃদয়ের প্রজ্বলিত অগ্নির নির্ব্বাণ হইল না। ব্রাহ্মজীবনের বহির্ম্মুখীন অবস্থা তাঁহার হৃদয়ের এই অগ্নিকে আরও প্রজ্বলিত করিয়া দিল। তাঁহার মনে হইল, সাধনাদ্বারা জীবন লাভ করিয়া, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের এই বহির্ম্মুখীন গতিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে। প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আহারে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। বহু রাত্রি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাপন করিতেন। অবশেষে, একত্রিশ বৎসর বয়সে, কর্ম্মত্যাগ করিয়া, তিনি শেষ জীবনের সাত বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করেন। প্রথম দুই বৎসর চিত্রকূট পর্ব্বতে ও শেষ পাঁচ বৎসর ওঁকারনাথ পর্ব্বতে তপস্যা করেন। সংসারত্যাগে

কৃত সংকল্প সাধু প্যারীলাল যখন কার্য্য-ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার পরিচিত, আত্মীয়, ধর্ম্মবন্ধু ও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছাত্রবৃন্দ অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে এ সংকল্প ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। গুরুশিষ্যে এমন মিষ্ট সম্বন্ধ একালে অতি বিরল। যেদিন প্রকাশ্য সভায় সকলে প্যারীলালকে বিদায় দিলেন ও ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন, সেদিনের দৃশ্য অতীব হৃদয়দ্রবকারী।

কর্ম্মত্যাগ করিয়া তিনি নলহাটীতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীদের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। এখানে সকলে তাঁহার সংকল্পে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা যাঁহাকে আহ্বান করেন, পৃথিবীর সকল বাধা তাঁহার নিকট তৃণের ন্যায়। তিনি কর জোড়ে সকলকে বলিতেন—"আমি অতি দুর্ব্বল লোক। চারিদিকের এই সকল চিত্ত-বিক্ষেপকারী ঘটনা ও প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়া আমার ন্যায় ব্যক্তির ধর্ম্মসাধন হয় না। আপনারা আমার প্রতি সদয় হইয়া প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দিন। আমি যদি ভগবানকে লাভ করিয়া, তাঁহার আদেশ পাই, অবশ্যই পুনর্ব্বার আপনাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইব। তাহাতে আমার জীবন সার্থক হইবে, আপনাদেরও মঙ্গল হইবে। এ অসার জীবন লইয়া আমি কি করিব? আপনারাই বা তাহাতে কি লাভবান হইবেন?"—তিনমাস এইরূপে সকলকে বুঝাইলেন, কত সান্ত্বনা করিলেন, কত আশার কথা বলিলেন। এই তিনমাস নিজেও বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

"জন-সমাজেই ধর্ম্ম সাধনের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র," বন্ধুগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। বিনয়ী প্যারীলাল শত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেন—নির্জ্জন সাধনের আবশ্যকতা কত বেশী। "মহাত্মা বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু, ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইঁহারা কি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বুদ্ধ শত বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সত্যজ্ঞান লাভ করেন, খ্রীষ্ট জোহনের নিকট অভিষিক্ত হইয়া চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় তপস্যা করেন। তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরে ঘটনা জানা যায় না; কিন্তু, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সময় তিনি কোন নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যার নিমগ্ন থাকিয়া জীবনের মহৎকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; মহম্মদ আড়াই বৎসর হেরা পর্ব্বতের উপরে গভীর তপস্যায় মগ্ন থাকিয়া মহান ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগকে যদি এত কঠোর সাধন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে হইয়াছিল, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের তদপেক্ষা কত অধিক সাধনার দরকার আছে! সংসারে থাকিয়া বীর সাধকগণ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সাধারণ ভাবে চলিতে পারেন বটে, কিন্তু উচ্চ ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদের ন্যায় একবার নির্জ্জনে গমন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতেই হইবে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উচ্চ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে লাভ করা দুষ্কর। বর্ত্তমান ব্রাহ্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ধর্ম্ম

আমাদের জীবনের উপরে উপরে ভাসিতেছে। ধর্ম্মের বাহিরের অভিনয় আছে,—ভিতরের বস্তু নাই। পাশ্চাত্য অনুকরণে লোক ঘোর রাজসিক ভাবে পূর্ণ হইয়া ভক্তি ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তাহার আনুসঙ্গিক পাপ ও দুর্ব্বলতা তো দেখা দিবেই। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশকে উদ্ধার করিবে, ইহাকে এমন হাল্‌কা ভাবে সাধন করিলে চলিবে না। অতএব আপনারা কৃপা করিয়া আমার জন্য প্রার্থনা করুন,—আমি নির্জ্জনে যাইয়া সেই ধন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসি। আমার জন্য, আপনাদের জন্য, এই দেশের জন্য আমাকে আপনারা সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দিন। সেই নিরীহ মানুষ এই সকল কথা বলিতে বলিতে অনবরত অশ্রুপাত করিতেন। মহাজনেরা যেমন জীবের দশা দেখিয়া অস্থির হইয়াছিলেন, সাধু প্যারীলালের নির্ম্মল আত্মাও দেশের, বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের, দশা দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং, বন্ধুদিগের শত চেষ্টা আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট, নলহাটী হইতে চিত্রকূট পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে ভ্রাতাকে বলিলেন—"আমার আজ কি আনন্দের দিন! অতঃপর আমার 'আমার' বলিবার ভগবান ভিন্ন আর কেহ থাকিবেন না। সংসারের দিক থেকে একেবারে অসহায় ও নিরাশ্রয় হইলে, তবে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত নির্ভরতা আসে। জগদীশ্বর দয়া করিয়া আমাকে সেই অনুকূল অবস্থা দিলেন। পিতা আছেন, তোমাদের দুঃখ কি?"

সাধু প্যারীলাল সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্যরত্ন লাভ করিতে গৃহ ছাড়িলেন। তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে বিদায় দিয়া সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য ঘরে ফিরিলেন।

সন্ন্যাস ও তপস্যা।

সন্ন্যাস যাত্রাকালে প্যারীলালের সঙ্গী—কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ—উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, ব্রহ্মসঙ্গীত ও আরও কয়েকখানি ধর্ম্ম গ্রন্থ তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং চিত্রকূট অবস্থান কালেও মাসে মাসে পুস্তক চাহিয়া পাঠাইতেন। তিনি প্রথম কয়েক মাস বন্ধু বান্ধবদিগকে পত্রাদি লিখিতেন এবং তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে দৈনিক কার্য্যাবলী লিখিয়া রাখিতেন। আমরা তাহার সেই দৈনন্দিন লিপি হইতে তুলিয়া দিলাম।

১৮৮৮।

১২ই আগষ্ট। রাত্রিতে নলহাটী হইতে বাহির হইয়া কোথায়ও বিশ্রাম না, করিয়া ১৩ই তারিখ প্রায় ১১টা রাত্রি নাইনি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পিতার কৃপায় পরম সুখে রাত্রি এবং তাহার পরদিন ১২টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ৪টার সময় মাকুর্ণি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রিতে পথ চলা অসম্ভব বোধ করিয়া, সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুরোধে, পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতে করিতে সুখে সে রাত্রি সে স্থানে অতিবাহিত করিলাম।

১৫ই। পূর্ব্বদিন গাড়ী হইতে নামিলেই পিতার কৃপায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজ ইচ্ছায় আমার সঙ্গী হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, আরও একটী ব্রাহ্মণ সঙ্গে ছিলেন। পিতার দ্বারা প্রেরিত দুইটী কোল * আমাদিগকে অর্দ্ধরাস্তা পর্য্যন্ত পথ দেখাইতে দেখাইতে আসিয়া, রাখিয়া প্রস্থান করিল। সেখান হইতে অগ্রগামী

* কোলজাতীয় লোক।

ব্যক্তির ঘোটকের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে আমরা প্রায় ১২টার সময় চিত্রকূট পৌঁছিয়া মন্দাকিনী নদীর অপরপারে সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করিয়া ফটকশিলাভিমুখে গমন করিলাম। স্থানটী ধর্ম্মের জন্যই যেন প্রস্তুত হইয়াছে। নদীর উভয় পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের গায় এবং নদীর উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর মন্দির। মন্দির সকল সন্ন্যাসী এবং দেব-দেবীতে পূর্ণ। ফটকশিলাভিমুখে পৌঁছিয়া নদীর মধ্যে দুইটী প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখিলাম। বোধ হইল যেন সেই দুইটীর জন্যই স্থানের নাম "ফটকশিলা" হইয়াছে। সেখানে তিন জন লোক ছিল। তাহারা স্নান করিবার জন্য এবং অন্য কার্য্যে সেখানে আসিয়াছিল। তাহারা বলিল উপরে এক ঘর আছে,—সেখানে উঠিবার রাস্তা নাই। আমি এক খাড়া উচ্চস্থান দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অপারক হইলাম। পুনরায় চেষ্টা করিয়া, অন্য রাস্তা দিয়া উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। মধ্যম রকমের একটা বাড়ী এবং তাহাতে অনেকগুলি ঘর ছিল। এখন বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যেস্থানে বসিয়া পিতাকে লাভ করিব বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে এখানে আসিলাম, সে স্থানের দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইল। * * * অনাহারে প্রায় ১৩ মাইল পার্ব্বতীয় পথ পার হইয়া আসিয়া এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া নানা প্রকার গোলযোগে পড়িলাম। একবার মনে হইল নীলকান্তকে পত্র লিখি, আর বার মনে হইল কুঞ্জলালকে টাকা পাঠাইতে লিখি এবং মহর্ষির শান্তি নিকেতনে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, খণ্ডগিরিতে প্রস্থান করি, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ হওয়াতে এবং পিতার কৃপা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতে বসিলাম। প্রার্থনার স্থান, কয়েকটা বড় বড় বৃক্ষের নিম্নস্থ একটী ভগ্ন দাঁদারার পার্শ্বস্থ বাঁধানো স্থান। যতই প্রার্থনা চলিতে লাগিল, ততই আশা প্রবল হইয়া অবিশ্বাস চলিয়া গেল। উপাসনা, প্রার্থনা এবং সেই স্থানেই শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত হইল।

১৬ই। পিতার অপার করুণায় একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া আমার জন্য কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি নানা স্থানের কথা বলিলেন। সে সকল স্থান দেবদেবীতে পূর্ণ এবং শুকমহাশয়দের আবাস স্থান মনে হওয়াতে যাইতে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার নিকট শুনিলাম—"নানকপন্থী এক বাবাজীর প্রকাণ্ড এক বাগান এবং বাড়ী কেবল উদাসীনদের জন্য আছে। আপনি সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন।" তাহাতে আমার মন বড় আনন্দিত হইল। আমি পিতার কৃপা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহারপর তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া এই পবিত্র স্থানে আনিলেন। আসিবামাত্রই নির্জ্জন একটা প্রকাণ্ড হলে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং দুই দিনের পর অন্ন এবং রুটি আহার করিয়া প্রচুর মার কৃপা অনুভব করিলাম।

"কি স্বদেশে কি বিদেশে
মা আমার সর্ব্বদা পাশে……"

নানা প্রকার কুস্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

১৭ই। প্রচুর মার কৃপা সম্ভোগ করি-

লাম। মা অন্য রুটি এবং পরমান্ন খাওয়াইলেন।

১৮ই। অন্য এক প্রকার যাইতেছে। দুই দিন হইল বৃষ্টি হইতেছে। খুব প্রার্থনা চলিতেছে। মা যেরূপ করিয়া আমার বাসস্থান এবং খাদ্য দিতেছেন, তাহা তাপসমালায় কোন কোন সাধকজীবনে যে পড়িয়াছি, তাহা অপেক্ষা কম আশ্চর্য্য নয়। এমন মাকে না পাইলে আর আমি গৃহে ফিরিব না। রাত্রিতে এক প্রকার জড়তা আসিয়া ঘুমকে অধিক করিয়াছিল।

১৯শে। আজ কাল্‌কার চেয়ে অবস্থা ভাল। পিতার কৃপায় উপাসনা গাঢ়তর হইতেছে। "যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা" এই গানের মর্ম্ম এখন আমি বুঝিতেছি।

২০শে। প্রাতঃকালে একব্যক্তি মহন্তের আজ্ঞানুসারে আমাকে অতি বিনীত ভাবে প্রস্থান করিতে বলিল। আমিও কিঞ্চিৎ প্রার্থনার পর গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলাম। পুনরায় ফটকশিলায় গেলাম। সেখানে কয়েকজন লোক ছিল; তাহারা অনসূয়া মার আশ্রমে যাইতেছিল। আমিও তাহাদের সঙ্গী হইলাম। ১২টার সময় এখানে পৌছিয়া, লছমন ভাণ্ডার পত্র দেওয়ার পরই রুটি ও ভাত খাইতে পাইলাম, তাহারপর অতি সুন্দর স্থানে এক নির্জ্জন গৃহ পাইলাম। আশ্রম অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতের দ্বারা বেষ্টিত; মধ্যে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। আশ্রমে অনেক প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘর আছে এবং অনেক প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা ঐ রূপেই রহিয়া গিয়াছে; যেহেতু সিদ্ধিবাবাজির মৃত্যুতে আশ্রমের আয় কমিয়াছে।

আশ্রমবাটিকা পর্ব্বতের বাহির করা (Projecting) শিরোদেশের নিম্ন হইতে আরম্ভ হইয়া পাদদেশের নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি পাদদেশের মন্দিরের বারান্দায় থাকি। রাত্রি এক প্রকার কাটিল।

২১শে। আমি আর উপরে যাই নাই; কাজেই দিনের বেলায় আমার আর খাবার আসে নাই। সন্ধ্যায়, মায়ের করুণায়, উপর হইতে যথেষ্ট দুগ্ধ এবং রুটি পাইলাম।

২২শে। অদ্যকার উপাসনায় বড় প্রীতি লাভ করিয়াছি। মায়ের কৃপায় বিশ্বাস এবং নির্ভরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। অদ্যও মা যথেষ্ট খাদ্য দিলেন।

২৩শে পাপের জ্বালায় মন বড় অস্থির।

২৪শে। জ্বালা আরও তীব্রতর। কাঁদিতে কাঁদিতে দিন যাইতেছে। সময় সময় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমার অবস্থা অন্তর্য্যামী জানেন।

২৫শে। গত কল্য বিকাল হইতে অদ্য প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। আজ যেরূপ পিতার কৃপা অনুভব করিতেছি, এরূপ জন্মে কখন করিয়াছি কিনা মনে পড়ে না।

ধন্য পিতার কৃপা!
জয় ব্রহ্মকৃপার!
ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম!

এইরূপ সময়ে যদি ব্রহ্মকৃপা লোককে রক্ষা না করে, তবে মানুষ বাঁচিতে পারে না।

২৬শে। অদ্য এক প্রকার ভালই যাইতেছে। এক ঘণ্টা অবস্থা ভাল ছিল না। কেবল অবিশ্বাসের জন্যই এইরূপ হয়। এখানে যে প্রকারে আমার খাদ্য আসিতেছে, তাহা অধিকতর আশ্চর্য্য। মায় অপার কৃপায়, একটি ভ্রাতা প্রত্যহ আমার খাদ্য

যোগাইতেছেন। এখানেও অন্ন রুটি এবং ডাইল মিলিতেছে। আমার প্রতিজ্ঞা আছে, আমি ভিক্ষা করিব না। যাহার পিতা বিশ্বাধিপ, সে ভিক্ষা করিবে কেন?

২৭শে। বিকালে খুব ভাল অবস্থায় ছিলাম।

২৮শে। আজ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় দিন যাইতেছে। পিতার কৃপা ধরিয়া আছি। দেখা যাক কি হয়।

২৯।৩০।৩১শে। অস্বাভাবিক পরিমাণে নরকভোগ চলিতেছে। এইপ্রকার থাকিলে জীবন-ধারণ আমার পক্ষে কঠিন হইবে। অদ্য বিকালে প্রার্থনায় খুব ভাব হইয়াছিল। শরীরের মধ্যে কেমন এক প্রকার কার্য্য হইতে লাগিল। সমস্ত বিকাল প্রার্থনায় কাটিল। সন্ধ্যার পর যেই আসন হইতে উঠিয়াছি এবং মনে করিতেছি, দাঁড়াইয়া কিছুকাল প্রার্থনা করি, অমনি অচৈতন্য হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেলাম। কিছুকাল পরে চৈতন্য হইলে দেখিলাম, হাতে পায়ে ঘা হইয়া গিয়াছে, আর বাহিরের লোক ভিতরে আসিয়াছে, এবং আমাকে ডাকিতেছে। পিতা মঙ্গলই করিবেন, কিন্তু আমি যে বিশ্বাসী হইতে পারিতেছি না।

আমি এখানে ধর্ম্মশালায় (পান্থ-নিবাসে) বাস করি। এই তিন দিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এখানে বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হওয়াতে, আমি প্রথম দিন একখানা প্রকাণ্ড পাথরের নীচে কাটাইয়াছিলাম, আর দুই দিন দুই রাত্রি স্থানাভাবে দেয়ালের মধ্যের আলমারির নীচের তাকে বাস করিয়াছিলাম। ধন্য পিতা! প্রত্যহই আমার গৃহে আমার খাদ্য যোগাইতেছেন। আমি এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কিছু চাই নাই।

সেপ্টেম্বর।

১লা। আজও নরকভোগ চলিতেছে। এখানে বড় গোলমাল হইতেছে। বর্ষার পর গুহাতে বাস করিব মনে করিতেছি। বর্ষা আরও দেড়মাস থাকিবে, শুনিতেছি। যাহা হউক, পিতাই এক প্রকার করিয়া দিবেন। বিকালে কথঞ্চিৎ ভাল ছিলাম। উপরে মহন্ত মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"বিনা গুরুতে সিদ্ধি হইবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি"। কিছু কটুভাষাও ব্যবহার করিলেন।

২রা। আজ পিতা দয়া করিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিতে দিতেছেন। আমি যে ঘরে বাস করি, তাহার কিছু দূরে, দক্ষিণের দিকে, নদীর তীরে অত্রিমুনি এবং অনসূয়া দেবীর আশ্রম। পৃথক পৃথক মন্দিরে উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাদের হৃদয়ের তেজ মানব হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া পারে না। কি জ্বলন্ত বিশ্বাস! যখন সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, তখন একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য অমিত তেজ এবং উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন। অনসূয়া দেবী অত্রিমুনির পত্নী। এইরূপই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হওয়া উচিত। মূর্ত্তি প্রকৃতই হউক আর অপ্রকৃতই হউক, দেখিলেই বোধ হয় তাহার মধ্য হইতে তেজ বাহির হইতেছে। ধন্য ধর্ম্মরত্ন! তোমাকে যে পাইয়াছে, সে যুগান্তরেও মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ সঞ্চালন করিতে পারে। ধন্য ভারতমাতা! তুমি এক সময় এমন কন্যা প্রসব করিয়াছিলে, যাঁহার তেজে বনভূমি এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মাতার দুই জোড়া

খড়ম প্রস্তুত হইয়াছে, এক জোড়া পিত্তলের আর এক জোড়া, বোধ হইল পাথরের। সে দুই জোড়া তাহার সম্মুখে একখানা ছোট চৌকির উপর স্থাপিত। আরও অনেক দেবমূর্ত্তি আছে, সেগুলির সহিত খড়মের পূজা হইয়া থাকে। অত্রিমুনির চেয়ে অনসূয়া দেবীই অধিক তেজস্বিনী ছিলেন, কারণ তাহার নামেই আশ্রমটি পরিচিত এবং প্রবাদ আছে, তাহার তপঃপ্রভাবেই স্বর্গ হইতে মন্দাকিনী নামিয়া আসিয়া আশ্রমের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রমের দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। তাহার গায়ে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে, যথা—শিব, গণেশ, কালী ইত্যাদি; কতকগুলি পুরুষ এবং স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। আমি সমস্ত দিন গুহার মধ্যে কাটাইয়াছিলাম।

৩রা। অবস্থা খারাপ। প্রায় ছটা পর্য্যন্ত গুহার মধ্যে ছিলাম। পুনঃ পুনঃ আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। যন্ত্রণা ক্রমাগতই অধিকতর হইতেছে। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, আমি খাঁটি অবিশ্বাসী। পিতার কৃপায় বিশ্বাস পাইলাম।

৪ঠা। অদ্য অবস্থা ভাল। প্রার্থনা করিতে পারিতেছি। পিতা কৃপা করিয়া "করুণাময়ী মহাশক্তি" এই নাম সাধন করিতে দিয়াছেন। তাহাতে সকল মেঘ দূর হইয়াছে। আজও অবিশ্বাস একবার দেখা দিয়াছিল; কিন্তু পিতার মহাশক্তিতে কুকুরের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। সর্দ্দী হইয়া জ্বরবোধ হইতেছে। পিতার ইচ্ছাতে ইহা হইতেও মুক্তি পাইব। রাত্রিতে জ্বর অধিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু পিতার আমার প্রতি কি আশ্চর্য্য কৃপা!

৫ই। আজ প্রাতঃকালে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। জ্বর আর নাই, আহার রীতিমত প্রত্যহই চলিতেছে। পিতা যাহা দেন তাহাই খাই এবং তাহাতেই সুস্থ থাকি। আহার গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া আবার বিকালে জ্বর আসিল।

৬ই। সমস্ত দিন জ্বর থাকিল। এই দিন উপবাস দিলাম।

৭ই। এই দিন প্রাতঃকালে জ্বরত্যাগ হইয়া শরীর সুস্থ হইল। আজও উপবাস দিলাম। রাত্রিতে বিছুমাত্র ঘুম হইল না।

৮ই। কম্প দিয়া জ্বর আসিল। জ্বর থাকিতে থাকিতেই ডাল ভাত আহার করিলাম। খাওয়ার পরেই জ্বর ছাড়িল।

৯ই। সমস্ত দিন সুস্থ থাকিলাম; কিন্তু রাত্রিতে ঘুম আসা বড় কঠিন হইল।

১০ই। জ্বর আসিল। বিকালে কিছু আহার করিলাম।

১১ই। ভাল রহিলাম। বিকালে কিছু আহার করিলাম।

১২ই। জ্বর হইল। অদ্য কুঞ্জলালকে পত্র লিখিলাম।

১৩ই। এখনও ভাল। শরীর খুব স্বচ্ছন্দ। পীড়াতে কখন পিতার এরূপ কৃপা অনুভব করি নাই। পিতা আমার মঙ্গলই করিতেছেন। ইহার মধ্যে পিতার মঙ্গল ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

১৪ই। জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় প্রেমময়! পিতঃ! পাপীর প্রতি তোমার অপার করুণা। এরূপ পাপীকেও কি পিতা, এরূপ ভালবাসিতে হয়? দেখ পিতা! তুমি এই বন্ধুবান্ধব-বিহীন স্থানে রোগ-শয্যায় আমাকে যেরূপ করিয়া পালন করিয়াছ, যেরূপ ভালবাসিয়াছ, তাহা তুমি জান আর আমি জানি। হায় পিতা! আজি যদি

বিশ্বাসী হইতে পারিতাম তবে না গলিয়া থাকিতে পারিতাম না। পিতা! তুমি ন্যায়বান, পরম দয়ালু। তোমার উপর যখন আমার সমস্ত জীবনের ভার, তখন আর আমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। তুমি আজ যেমন আমার শরীর সুস্থ করিয়া আমাকে অপার আনন্দ দান করিতেছ, পিতা, সেই প্রকার আমার মনকে ভাল করিয়া আমার হৃদয়ে তুমি নিত্য বিরাজ কর। তোমার পদে আমার কোটী কোটী প্রণাম। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

১৫ই। পরম দয়ালু পরম মঙ্গলময় পিতার কৃপায় আজ কয়দিন সুস্থ শরীরে অতিবাহিত করিলাম। অদ্য সুস্থসংবাদ দিয়া কুঞ্জলালকে পত্র লিখিলাম।

১৬ই। পিতা! এস্থান আর আমার ভাল লাগিতেছে না। আমাকে একটা নির্জ্জন স্থান ঠিক করিয়া দাও। পিতা! তুমি তো আমার অবস্থা সমস্তই জান, তবে কেন, প্রভু, আমাকে এইরূপ গোলমালের মধ্যে রাখিলে? আমি তোমাকে চাই—অন্য কিছু চাই না। আমাকে এরূপ স্থান দাও, যেখানে বসিয়া নিরাপদে তোমাকে ডাকিতে পারিব। পিতা! তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। আমি যে আর এরূপ করিয়া দিন কাটাইতে পারি না। আমাকে দয়া কর। দোহাই পিতা! তোমার নামে যেন আমা-দ্বারা কলঙ্ক পড়ে না।

১৭ই। পরম কারুণিক, পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আর একদিন অতিবাহিত হইতে চলিল। তাঁহার অপার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি।

১৮ই। অত্যকার দিনও পিতার কৃপায় অতিবাহিত হইতে চলিল।— কেবলই পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি, তবুও পিতাকে তেমন করিয়া ধরিতে পারিতেছি না—যে প্রকার ধরিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

১৯শে। প্রাণের পিতার কৃপায় তাঁহার অপার কৃপা অনুভব করিতেছি। এখনও আমার পাপ আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। পিতা আমাকে অবশ্য ভাল করিয়া দিবেন। রাত্রি ভাল ভাবে যায় নাই।

২০শে। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে পিতার অপার করুণা অনুভব করিতেছি।

২১শে। আজ আমার জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জর্জ্জ মুলারের জীবনের চেয়ে কম নয়। যে দুইটী ভ্রাতা আমাকে উপর হইতে এতদিন খাদ্য যোগাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন কাল সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি গুরু গ্রহণ করিয়াছেন?" আমি বলিলাম—"না। ঈশ্বরকে ডাকিয়া যদি তাঁহাকে না পাই, তবে গুরুতে আমার কি করিবে?" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"রামকৃষ্ণ কে ছিলেন?" আমি বলিলাম—"মানুষ।" ইহাতে তাহারা ভয়ানক চটিয়া আমাকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিল এবং মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য মনে করিল। আরও অনেক কথা হইয়াছিল;—তাহাতে তাহারা চটিয়াছিল। একজন অদ্য প্রাতঃকালেই গ্রামান্তরে তাহার বাটীতে প্রস্থান করিয়াছে, অন্যটী খাবার সময় আমার খাদ্যদ্রব্য আনিতে অস্বীকার করিয়া, আমাকে উপরে যাইতে বলিয়া গেল। আমি যথাসময়ে উপরে গেলাম, কিন্তু আমাকে খাবার জন্য ডাকিল না। পিতা ঘরে বসাইয়াই আমাকে খাদ্য দিবেন এই আজ্ঞা অবহেলা করিয়া উপরে আসিয়াছি বলিয়া এইরূপ ঘটিল মনে করিয়া

নামিয়া আসিলাম। আজ প্রাতঃকাল হইতেই পিতা আমাকে অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে সেই লোকটী আসিয়া "আমার জ্বর হইয়াছে" বলিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু পিতা কি পুত্রকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? খানিকপরেই উপর হইতে আর একব্যক্তি আমার খাদ্য লইয়া উপস্থিত। ধন্য পিতা। আর কি লিখিব!

২২শে। আজ কুঞ্জলালের পত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া চক্ষে জল আসিল। কুঞ্জলালের পত্রের উত্তর দিলাম। এই সকল গোলযোগে পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতে অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল।

২৩শে। অবস্থা মোটের উপর ভাল।

২৪শে। অবস্থা ভাল নয়।

২৫শে। আজকার অবস্থা ভাল।

২৬শে। দিন একপ্রকার ভালয় ভালয় গিয়াছিল। রাত্রি অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল।

২৭শে। প্রার্থনা হইতেছে। শারীরিক অবস্থা ভাল বোধ হইতেছে।

২৮শে। আজ পিতার কৃপায় ভালই যাইতেছে। একটা নির্জ্জন স্থানাভাবে বড় কষ্ট হইতেছে। সিদ্ধিবাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের এখনও দশদিন বাকী আছে। আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন লোক মিঠাই প্রস্তুত এবং অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে আসিল। আমাদের গৃহ আজও স্থির। গোলমাল হইলে চিত্রকূটে চলিয়া যাইব, ইচ্ছা করিতেছি।

২৯শে। দিন একপ্রকার ভাল ভাবেই যাইতেছে। আজও আমাদের গৃহে গোলযোগ নাই। দেখি পিতা কি করেন।

৩০শে। দিন পিতার অপার কৃপায় অতিবাহিত হইয়াছে। পিতার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

অক্টোবর।

১লা। বর্ত্তমান মাসে তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম করি। তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। তোমাকে একেবারে প্রাণ দিতে পারিতেছি বলিয়া আমার আনন্দ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি আমাকে শীঘ্রই মুক্ত করিবে, তাহাতে আর এক বিন্দুও সন্দেহ নাই। পিতা, এই মাসে আমাকে আরও উন্নত কর।

২রা। প্রাতঃকাল নীরসভাবে এবং বিকালবেলা অতি সরলভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল।

৩রা। ঐ।

৪ঠা। প্রায় ঐরূপ।

৫ই। অবস্থা ভাল না।

৬ই। পিতার কৃপায় অবস্থা অতি সুন্দর। কাল চিত্রকূট যাইব। শুনিলাম, ফটকশিলা শুক হইয়াছে।

৭ই। মহন্ত মহাশয় আমাকে যাইতে দিলেন না। আর দুই দিন পরে তাঁহার গুরুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ। আজও আমাদের গৃহ স্থির। পিতার কৃপা যথেষ্ট সম্ভোগ করিতেছি। পিতা আমাকে দিন দিন উন্নত করিতেছেন। পিতার কৃপা আসিলে কোন গোলমাল কিছু করিতে পারে না।

৮ই। অবস্থা মন্দ নয়।

৯ই। নীলকান্তের পত্র পাইলাম। অবস্থা পিতা ভালই রাখিয়াছেন।

১০ই। অদ্য প্রাতে উঠিয়াই স্থান পরিত্যাগ করিবার যোগাড় করিলাম। প্রায় একটার সময় চিত্রকূট পৌঁছিয়া উদাসীন

বাবাজিদের ওখানে বিশ্রাম করিলাম। পরে সন্ধ্যার সময়, জানকীকুণ্ডে পৌছিয়া এক গুহা পাইলাম। গুহা অতি সুন্দর। ইহাই আমার সাধনের স্থান নিশ্চয় করিলাম।

১১ই। অদ্য দিন ভাল যাইতেছে না। অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়াই গুহা পরিস্কারে নিযুক্ত হইলাম। প্রায় বারোটার সময় গুহা সংস্কার শেষ হইল।

১২ই। অদ্য দিন ভাল যাইতেছে না। অদ্য কুঞ্জ ও নীলকান্তের পত্রের উত্তর দিলাম। রাত্রি আরও ভয়ঙ্কর।

১৩ই। অবস্থা ভাল না। রাত্রি ভাল।

১৪ই। অদ্য পিতার অপার কৃপায় সমস্ত দিন তাহাকে ডাকিতে পারিতেছি। বিকালে একটি সাধুর নিকট গিয়াছিলাম। ধর্ম্মকথা হইতে হইতে এত ভাব হইল, যে তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। এই সাধু অযোধ্যা হইতে আসিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ব রাখেন।

১৫ই। অদ্যও পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি।

১৬ই। পিতার অপার করুণা বর্ষিত হইয়াছে। পিতার কৃপা ভিন্ন মুক্তির অন্য দ্বার নাই।

১৭ই। অদ্যও ভাল। ক্রমেই ভাল বোধ হইতেছে।

১৮ই। অদ্য জ্বর হইয়াছিল। অবস্থা খুব ভাল ছিল না।

১৯এ। অবস্থা পিতার কৃপায় ভাল।

২০এ। ক্রমেই ভাল।

২১এ। ঐ। রাত্রি বড় ক্লেশে গিয়াছে।

২২এ। পিতার দয়া বড় বর্ষিত হইতেছে।

২৩এ। পিতার কৃপায় ক্রমেই ভাল।

২৪এ। অতি সুন্দর ভাবে দিন যাইতেছে।

২৫এ। পিতার কৃপা অপার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়াও কীটস্য কীটের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মানব যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর অন্ন, বস্ত্র এবং মুক্তির জন্য কোন চিন্তা থাকে না, মঙ্গলময় নিজ হস্তে তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তিনি এই অবিশ্বাসীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬এ। আমি যেস্থানে এখন জপ করিতেছি, সেস্থানের কিছু বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। স্থানটি স্বর্গ তুল্য। ভারতে এরূপ স্থানের অস্তিত্ব খুব কম আছে; এই এই জন্যই পূর্ব্বতন ঋষিগণ এস্থানে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির জীবন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া সংসারের অতীত হইয়া ভগবানে চিত্ত সমাধান করিতেন। তাঁহার যে সকল গুহায় বসিয়া তপস্যা করিতেন, এখনও তাহার দুই একটী বিদ্যমান আছে। এখন পিতা আমাকে যে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার নাম 'জানকীকুণ্ড'। সমস্ত চিত্রকুটই রাম এবং সীতার লীলাভূমি। তাঁহারা এ স্থানে ঋষিদের আশ্রমে ছিলেন, বনে বনে মৃগয়া করিতেন, আমোদ প্রমোদ করিতেন, সে সমস্ত স্থান এখন পবিত্র ভাবে রক্ষিত হইতেছে। এস্থানে নদীর গঠন অতি সুন্দর। অতি অল্প-বিস্তৃত দুইধার হইতে যেন শ্বেত প্রস্তর দ্বারা বাঁধানো দুই Projecting অংশ আসিয়া প্রায় মিলিত হইয়াছে। বোধহয় ঐ দুই অংশ সময়ে কঠিন মাটি ছিল এখন শ্বেত প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। দুই দিকে প্রশস্ত নদী, মধ্যস্থান অপ্রশস্ত প্রণা-

লীর ন্যায়; কাজেই নদীর বেগ এখানে অধিক এবং সর্ব্বদাই কল কল শব্দে স্বচ্ছ জল প্রবাহিত হইতেছে। এত অপ্রশস্ত যে এখন অনায়াসে লাফাইয়া এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাওয়া যায়। ঐ প্রস্তরে, আমাদের পার্শ্বে (অর্থাৎ চিত্রকূট যে ধারে স্থাপিত সেই পার্শ্বে) কতকগুলি মানুষের পদচিহ্ন আছে। এখানে প্রবাদ যে সে গুলি জানকীর পদচিহ্ন সুতরাং-ই তীর্থ স্থান। সেখানে কতলোক আসিয়া ভক্তিভাবে প্রনাম করে এবং গড়াগড়ি দেয়। এইস্থান সাধকদের জন্য বিখ্যাত। এ স্থানে অনেকগুলি সাধক আছেন; ইঁহারা সকলেই রামভক্ত বৈষ্ণব। ইঁহারা আমাদের দেশের বৈষ্ণবের ন্যায় নিরক্ষর নহেন। সকলেরই সংস্কৃতে এক প্রকার প্রবেশ অধিকার আছে। ভিক্ষা আর সাধনই ইঁহাদের কার্য্য। এক একজন দূরদেশ হইতে আসিয়া এক এক গহ্বরে পড়িয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদগত কুসংস্কার অতি অল্পই আছে। আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজের লোক জানিয়াও তাঁহারা ঘৃণা করেন না, একসঙ্গে বসিয়া খান, দণ্ডবৎ করেন। একজন বলিলেন—"আমার আবার জাত কি?" যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ দেব-সঙ্গ লাভ করা খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। এই সকল সাধক নদীর তীরে স্বহস্ত-খোদিত অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী সাধক দ্বারা খোদিত গহ্বরে বাস করেন। গহ্বরগুলি মাটির নীচে। সকল গুলিরই খোলার দ্বারা ছাওয়া বারান্দা আছে। একটী পাকা কোঠাও আছে। দুইটী ঘর কেবল মাত্র খোলার ছাউনি, গহ্বর নাই। পিতা আমাকে যে গৃহটি দিয়াছেন, সেইটিই সকলের চেয়ে সুন্দর স্থানে স্থাপিত। আমার গৃহটির মাটির নীচে, তিনটি প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠ তিনটি অল্প-বিস্তৃত। প্রথমটিতে আলো আছে, দ্বিতীয়টি অর্দ্ধ আলো বিশিষ্ট, তৃতীয়টি প্রায়ই অন্ধকার। শীত ভিন্ন ইহার মধ্যে থাকা যায় না। শীতকালে বোধহয় কাপড় না হইলেও চলে। খোলা দ্বারা ছাওয়া একটী বারান্দা আছে; বারন্দাটির মধ্যে গলি, যেমন আমাদের দেশের দরজা ঘর। তাহার একপার্শ্বে উনুন এবং খা'বার স্থান; অন্য পার্শ্বে আমি দিনেরবেলায় পিতাকে ডাকি। নানাপ্রকার বৃক্ষে গহ্বরটী পরিবেষ্টিত, তাহার মধ্যে আমার প্রিয় নিমগাছই অধিক। প্রাঙ্গনটী আমি প্রস্তরদ্বারা অতি সুন্দর করিয়া লইয়াছি। পিতাই আমার সহিত কার্য্য করিয়া সুন্দর করিয়াছেন। নানাপ্রকার সুন্দর পাখী আসিয়া আমাকে আনন্দিত করে। ময়ূরগণ স্বচ্ছন্দে নদীর মধ্যে বিচরণ করে, কারণ এখানে তাহাদিগকে হিংসা করিবার কেহ নাই। নদীর মধ্যে মৎস্যের ক্রীড়া বড় সুন্দর। জানকী-কুণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি মাছ আছে। স্বচ্ছজলে তাহাদের ক্রীড়া দেখা যে কি সুন্দর, তাহা না দেখিলে জানা যায় না, আর বাঙ্গালাদেশের লোকের তাহা বুঝিবারও ক্ষমতা নাই। এখানে সকল স্থানেই মাছ মানুষকে দেখিয়া ভয় পায় না। আমার আশ্রমের নীচেও কয়েকটী মাছ আছে। আমি তাহাদিগকে ছোলা খাইতে দিই। নদীর মধ্যে শ্বেত-প্রস্তরের বেদীর ন্যায় সুন্দর বেদী আছে। আমার অবস্থা আজ ভাল। কল্য আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল—এখন পিতার কৃপা।

২৭শে। অধিকাংশ সময় সাংসারিক ভাবে অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া দুঃখ পাইয়াছি; তথাপি পিতার অপার কৃপা

হইতে বঞ্চিত হই নাই। অন্য স্থানের বিবরণ লেখা হইল না।

২৮শে। আজ পিতা ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। মুক্তি দিবার জন্য পিতা সর্ব্বদা প্রস্তুত, কেবল নিজ দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এত দিনে পিতার কুটীর খানি বেশ পরিষ্কার হইল। স্থানের বর্ণনা—

পূর্ব্বদিকে, নদীর অপর পারে, কিছু দূরে, পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তরে একটী লম্বা পর্ব্বত, দক্ষিণে আর একটী ঐরূপ, মধ্য স্থানে নৈবেদ্যের ন্যায় একটী ছোট পাহাড়। এই সকল পাহাড় বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত। আমার গৃহখানির মুখ উত্তর দিকে—পূর্ব্বদিকে কিছু ফিরানো, সুতরাং সূর্য্য যখন পাহাড়ের অপর পার্শ্ব হইতে উদয় হয়, তখন তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। আমাদের পার্শ্বে ও পশ্চিম দিকে অনেকগুলি পাহাড় আছে, তন্মধ্যে কান্তানাথই সুন্দর। এই পর্ব্বতটীর সৌন্দর্য্য অপার। আমি এক দিন ভাল করিয়া দেখিয়া লিখিব।

২৯শে। আজ কিছু নীরসতা অনুভব করিতেছি। অনেক দিনের পর অদ্য কেবল ভাত খাইয়াছি। দেশের খাদ্য খাইয়া বড় প্রীতি হইল।

৩০শে। আজও প্রাতঃকাল নীরবভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের উপাসনার সময়ে পিতার কৃপা অনুভব করিতে পারিলাম। বিকালে কান্তা পর্ব্বত দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহাতে অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম হইয়াছিল এবং আসিতে আসিতে রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া কিছু ঠাণ্ডা লাগাতে শরীর খারাপ হইয়াছিল। কান্তা পর্ব্বতের বিবরণ—

পিতার অনন্ত সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে ইহা একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পর্ব্বতটী পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ—প্রায় গোলাকার। ইহার পাদদেশ শত শত সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার সমস্তগুলিই দেবমূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। যে গুলিতে কোন প্রকার নির্ম্মিত মূর্ত্তি নাই, সে স্থানে একখানা প্রস্তর থাকিয়া তাহার কার্য্য সমাধা করিতেছে। এই মন্দিরগুলির পাদদেশ দিয়া আবার এক প্রস্তর নির্ম্মিত বলয়াকার রাস্তা পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াছে। রাস্তাটী প্রস্তরদ্বারা উত্তমরূপে গঠিত। এই রাস্তার বাহিরে অন্যান্য লোকের আবাস স্থান; দুই এক স্থানে সীমা অতিক্রম করিয়া ভিতরেও গিয়াছে। মন্দিরগুলির উপরে, পর্ব্বতের একেবারে পাদদেশে পিতা বৃহদাকার প্রস্তর দ্বারা আর এক বেষ্টনী দিয়াছেন; তাহার উপর সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। উপরের চেয়ে নীচের বৃক্ষগুলি কিছু বড় বলিয়া বোধ হইল। পর্ব্বতটী যে কি সুন্দর, তাহা না দেখিলে অনুভব করা কঠিন। হিন্দুগণ এই পর্ব্বতটী, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং উড়িষ্যায় আর একটী কি পর্ব্বত—এই তিন পর্ব্বতকে ভগবানের খাস পর্ব্বত বলেন।

৩১শে। আত্মার অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু গত দিবসের অনিয়মে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে পুনরায় জ্বর হইয়াছিল। পিতার কৃপায়ই জ্বর ভাল হইবে।

নভেম্বর।

১লা। পিতা আজ বিশেষ করিয়া তাঁহাকে অনুভব করিতে দিতেছেন। শরীর মন সুস্থ।

২রা। পিতার কৃপা প্রচুর বর্ষিত হইয়াছে।

৩রা। পিতার কৃপায় আজ সুস্থ শরীরে

থাকিয়া কাল্‌কার চেয়ে অধিকতর কৃপা অনুভব করিতেছি। পিতা আমাকে রাজ-পুত্র করিয়া এস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমাকে যেস্থানে রাখিয়াছেন, তাহা সাধন ভজনের পক্ষে এই চিত্রকুটের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গৃহটী অতি পরিপাটী এবং নির্জ্জন,—এমন নির্জ্জন যে আমার দুধওয়ালা ভিন্ন অন্য লোকের সহিত প্রায়ই দেখা হয় না। যদিও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আসেন, খুব অল্প সময় থাকিয়াই চলিয়া যান। কেবল অযোধ্যা হইতে আগত একটী সাধক-বন্ধু সময় সময় আসিয়া ধর্ম্মকথাতে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এদিকে পিতার কৃপা প্রচুর বর্ষিত হইতেছে। যখনই তাঁহার চরণ-তলে বসিতেছি, তখনই কৃপা করিতেছেন। পিতার ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্র আমাকে নবজীবন দান করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।

অন্যান্য সাধকদের দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের অনেক সময় নষ্ট হয় এবং বড় ক্লেশ পাইতে হয়। পিতার অপার কৃপায় গৃহে বসিয়া আমি তাঁহার প্রেম-খাদ্য ভক্ষণ করি। এখানে কাঁচা দুধই বিক্রয় হয়; কিন্তু পিতার কৃপায় আমার দুধওয়ালা আমায় দুধ গরম করিয়া দেন। মাসের মধ্যে পনের দিন ছোলা খাই, অবশিষ্ট পনের দিনের মধ্যে পাঁচ দিন ভাত, পাঁচ দিন রুটি, আর পাঁচ দিন ছাতু খাই, সুতরাং আমি রান্নার দায় হইতেও এক প্রকার মুক্ত। আর সে রান্নাও অতি অল্প সময়ের জন্য, কারণ কেবল ভাত এবং রুটি ভিন্ন ত আর কিছু রান্না করি না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে জলে স্নান করি, তাহার ন্যায় নির্ম্মল জল আর কমই আছে। যদিও কৌপিন পরি, তাহা হইলেও বস্ত্রের অভাব অনুভব করি না; কারণ আমার কোট পরিলেই সমস্ত অভাব চলিয়া যায়। আর এখানে কৌপিন ধারণ লজ্জাকর নহে, কারণ আমার সহসাধকগণ সকলেই কৌপিনধারী। আমার গৃহের দ্বার বন্ধ করিলে, শীতের বাবারও সাধ্য নাই যে প্রবেশ করে; সুতরাং শীত-কষ্টও আমার এপর্য্যন্ত হয় নাই। এই প্রকার পিতা আমাকে এখানে পরম সুখে রাখিয়া-ছেন। নিমন্ত্রণেরও অভাব নাই। আমি সমস্ত ভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হই-তেছি। মধ্যে মধ্যে যদিও অবিশ্বাস আসে, শীঘ্রই পিতা তাহা হইতেও আমাকে মুক্ত করিবেন। কারণ—আমি তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছি। লোকে এমন গুরুকে ফেলিয়া মানুষকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়! এ গুরু যে কি করেন, তাহা আর কি লিখিব!—মহাপাপীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধারের পথে লইয়া যান; অবি-শ্বাসীকে বিশ্বাসী করেন, অধিক কি, নিয়ত সঙ্গে থাকিয়া তাহার সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন। অধিক কি লিখিব—পিতা যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

৪ঠা। লালসার বশবর্ত্তী হইয়া নীরস ভাবে দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। রাত্রিতে পিতা চরণে স্থান দিয়াছিলেন।

৫ই। অদ্য প্রাতঃকালের উপাসনায় পিতার কৃপায় খুব প্রীতি অনুভব করিয়া-ছিলাম, তৎপর ছাতু দুধ ভক্ষণ করিয়া মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম—সেই কান্তা পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে। আমার সঙ্গী আমার দুধওয়ালা বৈরাগী। ডাকঘরে যাইয়া মার পত্র পাই-লাম। তাহার উত্তর কলম অভাবে অতি বিশ্রী ভাবে দিলাম। কুটীরে আসিয়া নিদ্রা

কর্ম্ম সমাধা করিতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার পর অবস্থা ভাল ছিল না।

৬ই। মোটের উপর অবস্থা মন্দ নয়। স্বর্ণ এবং মহেশকে পত্র লিখিলাম। আমার খাদ্য—

দয়াময়ের, মঙ্গলময়ের যে পাপীর সহিত কি লীলা খেলা, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমি যেদিন এখানে পৌছিয়াছিলাম, কেবল সেই দিন অনাহারে ছিলাম। ফটকশিলা দেখিয়া আমি যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, আর উপায়ান্তর নাই, কোথায় যাইব—কাহারও সহিত আলাপ নাই, তখন চিত্রকূটের দিকে আসিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া, একটা ভাঙা ইঁদারার ধারে সমস্ত রাত্রি কাটাইলাম। কিন্তু যিনি কীটানু-কীটেরও পর্য্যন্ত তত্ব লন, তিনি কি তাঁহার পুত্রকে অনাহারে রাখিতে পারেন? এক ব্যক্তি খুব প্রাতে সেখানে উপস্থিত। সে আমারই জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সে আসিয়াই আমার জন্য কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর সে আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, আমাকে উদাসীন নানকপন্থী বাবাজীদের আশ্রমে লইয়া গেল। সেখানে যাওয়ার পর রুটি, ভাত, পরমান্ন প্রভৃতি পিতা আমাকে খাওয়াইলেন। এই প্রকার রুটি, লুচি, পরমান্ন প্রভৃতি খাইয়া চারিদিন সেখানে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। একেবারে সেখানে থাকিলে এক 'বাবু' হইয়া উঠিতাম; এই জন্য পিতা আমাকে অনুসূয়া দেবীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। ২০শে আগষ্ট হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সেখানে কাটাইয়াছি। পীড়ার জন্য দুইদিন উপবাস ভিন্ন আর উপবাস দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এখানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অতি বিচিত্র। প্রথম দিন যাইয়াই খাদ্য পাইলাম। দ্বিতীয় দিন আমার সেই নিভৃত স্থান হইতে আমি বড় বাহির হই নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সিদ্ধি বাবাজির এক চেলা আসিয়া, আমি উপরে দেখা করিতে অথবা খাইতে যাই নাই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। তাহার পর দেখি, সন্ধ্যার সময় তিন খানা রুটি এবং দুধ আমার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার পর দিন বুঝি উপরে গিয়াছিলাম, কিন্তু বাঁদ-রের উৎপাতে এবং চাকরদের তাচ্ছল্যে আর উপরে যাইব না ঠিক করিলাম। কিন্তু পিতা কি পুত্রকে উপবাসে রাখিতে পারেন? একব্যক্তি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিতে লাগিল। খাদ্য আনয়ন সহজ ব্যাপার নয়। একশত দেড়শত হাত উপর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এবং সেই ভয়ঙ্কর বাঁদরের উৎপাত সহ্য করিয়া কে কাহার জন্য খাদ্য আনিয়া থাকে? দুই তিন খানা রুটি আসিত, শেষে আমার অনুরোধে এক-খানা দেড়খানা আসিত। কোন দিন লুচি এবং অন্যান্য মিষ্টখাদ্যও জুটিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইতে হইতেই আর এক ব্যক্তি আসিল। সেও আসিয়া পিতার আজ্ঞায় আমার সেবায় নিযুক্ত হইল। জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রি একটা কি দুইটার সময় আমার জন্য মোহনভোগ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। পিতা এইরূপে আমার সেবায় নিযুক্ত আছেন। এই সময়ে আমার বোধ হইত, আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া মঙ্গলময় পিতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রুটি কাপড়ে বাঁধিয়া এবং ঘটিতে জল লইয়া আনিয়াছেন। এইরূপে দিন যাইতেছে, এরূপ সময়ে পূর্ব্বে কোন স্থানে লিখিত এক ঘটনাতে তাহারা

আমাকে 'নাস্তিক' বলিয়া ঠাওরাইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিবে না ঠিক করিল। পরদিন বলিল—"আপনি উপরে যাইবেন।" খা'বার সময় উপরে গেলাম, কিন্তু কেহ কথা বলিল না। আমি চলিয়া আসিয়া শুইয়া রহিলাম। খানিক পরে যিনি আমার খাদ্য আনিতেন, তিনি "জ্বর হইয়াছে" বলিয়া শুইয়া কোঁ কোঁ করিতে লাগিলেন। তাহার কোঁকানি দেখিয়া ভাণ বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে, কি আশ্চর্য্য, যাহারা কোনদিন আমার খোঁজ লয় না (একদিন আমার খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) এরূপ এক ব্যক্তি আমার খাদ্য দিয়া গেল। আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া খাইতে লাগিলাম। আর সেই ব্যক্তির জ্বর ঠিক এই সময় ছুটিল। তাহার পরদিনই পিতা কুঞ্জলালের দ্বারা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া টাকা পাঠাইলেন। ঠিক এই সময় অন্য দুই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আমার সেবায় রত হইল। একদিন খাবার আসিল না দেখিয়া রাত্রিতে খিচুড়ি রাধিয়া আমাকে খাওয়াইল। এখানে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত উদাসীনবাবাদের ওখানে রুটি এবং খিচুড়ি খাইয়া আমার বর্ত্তমান বাসস্থানে আসিলাম। এখন পিতা খাদ্যের ব্যবস্থা নিম্নলিখিত প্রণালীতে করিয়াছেন—ইহাতে আমি হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতেছি—

১ম দিন	—	ভাত এবং দুধ
২য় "	—	ছোলা " "
৩য় "	—	রুটি " "
৪র্থ "	—	ছোলা " "
৫ম "	—	ছাতু " "
৬ষ্ঠ "	—	ছোলা " "

ইহাতে আমাকে মাসে কেবল দশদিন রান্না করিতে হইবে। অদ্য আবার জ্বর হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থা মন্দ ছিল না।

আমার শয্যা।

প্রথমদিন বৃক্ষতলস্থ ভাঙ্গা ইঁদারার পার্শ্বে। তাহার পর কোট এবং ক্ষুদ্র আসনের উপর শরীরের উপরিভাগ রাখিয়া শয়ন করিয়াই যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। জ্বর হইবার পর হইতে কোট এবং আসনখানা বিছাইয়া শয়ন করিতাম। এখন কোট গায় দিই, সুতরাং আসন এবং তাহার উপরের কাপড় খানা প্রথমতঃ শুইবার সময় বিছাইয়া লই, কিন্তু তাহা থাকে না, প্রকৃতপক্ষে মাটীতেই শুইতে হয়। উপাধান একখণ্ড প্রস্তর।

চিত্রকূট।

চিত্রকূটের বসতি প্রায় এখান হইতে দেড় মাইল দূরে নদীর অপরপার্শ্বে স্থাপিত। নদীর উভয় ধার দিয়া উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির সকল শোভা পাইতেছে। স্থানটী দেখিলেই কেবল ধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়। গ্রামের মধ্যে দেয়ালনির্ম্মিত গৃহ খাপড়া দ্বারা ছাওয়া, উপরে কাঁটা। কাঁটা না দিলে বানরভায়ারা খাপড়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আমাদের এখানে বানর নাই, কিন্তু দুই একদিন এক এক পাল আগমন করেন। তাঁহারা স্থায়ীরূপে থাকেন না, কিন্তু যেটুকু থাকেন, তাহাতেই অস্থির করিয়া তোলেন। গ্রামের মধ্যে সামান্য রকমের বাজার আছে; মিঠাই, চাল, ডাল প্রভৃতি পাওয়া যায়। নদীর পরপারেও এইরূপ আর একটী বাজার আছে, আর কান্তা-পর্ব্বতের নিকটও অন্য একটী আছে। এই সকল স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রামের মধ্যে সীতাপুর নামক স্থানে ডাকঘর আছে। কান্তানাথ পর্ব্বতের নিকটও এক-

ডাকঘর আছে। অধিবাসীদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আছেন।

আমার সুখ।

যখন পিতার অপার করুণায় নিষ্পাপ থাকি, তখন সকলই আমাকে অপার সুখ দেয়। গৃহের দিকে তাকাইলে গৃহ তাঁহাতে পরিপূর্ণ দেখি, বৃক্ষ, পর্ব্বত, বন, আকাশ সকলই মঙ্গলময় দেবতায় পরিপূর্ণ দেখিতে পাই। তখন আনন্দময় পিতার পুত্র হইয়া, আনন্দে তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে থাকি। আমার সে সময়ের আনন্দ লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। পিতার অপার কৃপায় আমি দিন দিন উন্নতি-লাভ করিতেছি। পিতা আমার অবিশ্বাস দূর করিতেছেন, আমার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করিতেছেন, আমার রিপুদিগকে দমন করিতেছেন। যখন পিতার প্রেমান্ন ভক্ষণ করি, প্রেমদুগ্ধ পান করি, তখন যে কি সুখ অনুভব করি— বলিতে পারি না। যখন মঙ্গলময়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রাত্রিতে ঘুমাই, তখন আর আমার কোন চিন্তা থাকে না। পীড়িত অবস্থাতে মঙ্গলময় আমাকে কোলে কোলে করিয়া রাখেন, সুতরাং আমার আর অসুখের সম্ভাবনা কি? বাসনা, লালসা প্রভৃতির দিকে মন গেলে যখন পিতাকে দেখিতে পাই না, তখন যে যন্ত্রণা অনুভব করি, তাহা অবর্ণনীয়। পাপ দুঃখের মূল। লোকে নিষ্পাপ থাকিলে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গভোগ করিতে পারে; কিন্তু নিষ্পাপ থাকা নিজের আয়ত্ত নয়। সম্পূর্ণ ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর না করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায় না। যে নিজের বলে নিষ্পাপ হইতে চেষ্টা করিবে, সে আরও পাপে পড়িবে।

আমার কুটীরের সম্মুখে বাবলা গাছের ন্যায় একটী কচি কচি পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটী একেবারে সম্মুখে। বৃক্ষটীর পত্রে পত্রে ব্রহ্মনাম লিখা। এই বৃক্ষে কত রকম ছোট ছোট পাখী আসিয়া আমার চিত্তরঞ্জন করে, বলিতে পারি না। ইহাদের মধ্যে দুইটী পাখী অতি সুন্দর। তাহারা দেখিতেও সুন্দর, স্বরও মিষ্ট। ইহাদের মধ্যে একটী পাখী আমাকে দেখিয়া ভয় করেনা, অতি নিকটে আসে। তাহাকে দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়; পূর্ব্বকালের ঋষিদের আশ্রমের কথা মনে হয়। ইহারা এবং আর দুইটী অতি ক্ষুদ্র পাখী নিয়ত বৃক্ষে বাস করিয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছে। আমার চিত্ত বিনোদনার্থে পিতা এই সুন্দর গায়ক এবং নর্ত্তককে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন কোন স্থান হইতে শ্রান্ত হইয়া আসিয়া গৃহের সম্মুখস্থ প্রস্তরে বসি, তখন ইহারা আমার হৃদয়ে পিতার অপার প্রেম ঢালিতে থাকে। ময়ূরগণ সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। নদীতে মৎস্যগণও আমাকে অপার সুখ দেয়।

৯ই। পিতার কৃপায় অবস্থা ভাল। এ পর্য্যন্ত শরীরও ভাল আছে। বোধ হয়, ভালই থাকিবে।

ফটকশিলা।

আমি যেখানে বাস করি, সেখান হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে নদীর মধ্যে দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে; তাহারই নাম ফটকশিলা। প্রবাদ, এখানে রামচন্দ্র নিজ হস্তে সীতাকে সাজাইয়াছিলেন। উপরে একটী ভগ্ন গুহা আছে; কোন যোগী সেখানে যোগাভ্যাস করিতেন। পর্ব্বতের উপরে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বাড়ী আছে। বাড়ীটীর ভগ্নদশা।

বিকালে পিতার কৃপায় জ্বর হইয়াছিল। আমার এই সমস্ত লইয়া আমি পরমসুখে পিতার ক্রোড়ে বাস করিতেছি। যদি জীবন পাইয়া এই স্থান হইতে যাইতে পারি, তবে জগৎকে শুনাইব, পিতার কৃপা কেমন।"

এই সময় প্যারীলালের তপস্যার প্রথমাবস্থা ; এই তাঁহার তপস্যার আরম্ভ। ক্রমে ধর্ম্মজীবনের গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্রাদি লেখা বন্ধ করিলেন ; অনুক্ষণ ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে বিভোর থাকিতেন।

দুই বৎসর চিত্রকূটে তপস্যার পর প্যারী লাল ওঁকার নাথ পর্ব্বতে গমন করেন। চিত্রকূটে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না, প্রায়ই জ্বর হইত। তিনি শুনিলেন, মধ্যভারতে নর্ম্মদা তীরে ওঁকারনাথ সাধুভক্তের তপঃক্ষেত্র। তিনি ওঁকারনাথে যাত্রা করিলেন।

ওঁকারনাথ পর্ব্বত ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত। নর্ম্মদা এই স্থানে আসিয়া দ্বিধা হইয়া পর্ব্বতের দুই প্রান্ত দিয়া বক্রগতিতে বহিয়া পর্ব্বত শেষে আসিয়া আবার মিলিত হইয়াছে। নদীর এই বক্র গতিতে পর্ব্বতের আকার "ওঁ"এর ন্যায় হইয়াছে। নর্ম্মদা যেন রজত রেখায় পর্ব্বত গাত্রে "ওঁ" লিখিয়াছেন। নদীর উপরেই পর্ব্বত গাত্রে সাধকদের গুহা বা গুফা।

পর্ব্বতের পাদদেশে সহর। সহরে ওঁকার নাথ শিবের মন্দির ; একটী বাজার আছে। এই স্থানে ইন্দোর-রাজের অধীন এক ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় নরপতি বাস করেন।

প্যারীলাল চিত্রকূট হইতে আসিয়া সন্ধ্যা কালে নর্ম্মদা পার হইয়া এই সহরের এক মিঠাই-বিক্রেতার দোকানে বিশ্রাম করেন ; পরে পর্ব্বতে উঠিয়া গুহা-বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখন হইতে তিনি স্নানাহার, নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিলেন, মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। এই সময়েই তাঁহার নাম "মৌনীবাবা" হইল।

ঘটনাক্রমে, মিঠাই-বিক্রেতার দোকানে মৌনীবাবার পদার্পণের পর হইতে, তাহার ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। মৌনীবাবার আশীর্ব্বাদে এইরূপ হইয়াছে মনে করিয়া, সে সস্ত্রীক, তাঁহার আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ভিক্ষা করিল। মহাত্যাগী বৈরাগী মৌনীবাবার কাহারও সেবা গ্রহণের আবশ্যকতা কি ? তিনি তাহাদের ব্যাকুলতাতে প্রতিদিন বিকাল বেলায় একপোয়া দুধ ও বেলপাতার রস গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাই তাঁহার তখনকার দৈনিক আহার।

মিঠাই-বিক্রেতা কোন কোন দিন আধ সের, তিন পোয়া দুধ জ্বাল দিয়া একপোয়া করিয়া আনিত, মৌনীবাবা বুঝিতে পারিয়া, ইহাতে তাঁহার তপঃবিঘ্ন হয় বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি সেবা গ্রহণ করেন না বলিয়া মিঠাই-বিক্রেতা ও তাহার পত্নী বড় ক্ষুব্ধ হইত। অবশেষে তাহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া একটী গুফা নির্ম্মাণ করিয়া দিবার অনুমতি চাহিল ; মৌনীবাবা সম্মত হইলেন।

কিছুদিনের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ রূপে মৌনীবাবার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বিকাল বেলায় একবার মাত্র গুহার বাহির হইয়া নর্ম্মদায় আসিতেন। সেই সময় দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য, গুহাদ্বারে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। একাদশীতে সমস্ত

দিন উপবাসের পর, কত লোক তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া জলগ্রহণ করিবার আশায় দ্বারে পড়িয়া থাকিত। এক একদিন মৌনীবাবা গুহা-দ্বার খুলিয়াই জনতা দেখিয়া পুনরায় দ্বার বন্ধ করিতেন। ইন্দোরের মহারাজা হোলকার একদিন নর্ম্মদাস্নান করিতে আসিয়া মৌনীবাবাকে দেখিতে আসেন। মৌনীবাবা দ্বার খুলিতেই তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, একব্যক্তি হোলকারের পরিচয় জানাইলেন। শুনিয়াই মৌনীবাবা গুহাপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন ;--হোলকার দ্বাররোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"বাবা, আমাকে উপদেশ দিন।" মৌনীবাবা উর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন—"ঈশ্বরই মুক্তিদাতা," এবং আপনাকে দেখাইয়া ইঙ্গিত করিলেন—"আমি কিছুই নই।" হোলকার কর্ত্তৃক তাঁহার চরণে অর্পিত সহস্র মুদ্রা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে ইঙ্গিত করিয়া মৌনীবাবা দ্বাররোধ করিলেন। ইহার পর তিনি দেবনাগর অক্ষরে গুহা-দ্বারে লিখিয়া রাখিলেন—

"নাহং ব্রাহ্মণর্নচ সাধুঃ।"

এই সময়ে এক ব্রাহ্ম পরিব্রাজক (পরলোকগত কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয়) খাণ্ডোয়াতে আসিয়া এক বাঙ্গালী সাধু পুরুষের যশোবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে ওঁকারনাথে আগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদেরই বন্ধু সাধু প্যারীলাল। প্যারীলাল তখন মৌনী, কথা কহেন না। বন্ধু যাহা প্রশ্ন করিতেন, তাহার উত্তর তিনি প্রস্তর খণ্ডে লিখিয়া দিতেন; বন্ধু তাহা আপন দৈনন্দিন লিপিপুস্তকে উঠাইয়া লইতেন। আমরা নিম্নে তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কাহারও নিকট কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; কেবল ভগবানের নিকট কাঁদিয়াছি। তিনি বাধ্য করিয়া আসন, প্রাণায়াম, মনঃসংযম করিয়া দিয়াছেন। অল্প কয়েক দিন হইল দেখিতেছি, আর নিদ্রার প্রয়োজন নাই; কারণ নিদ্রা গেলেই এরূপ একপ্রকার অনুভূতি হয়, যাহাতে যোগের নাশ হয়। কি বলিব—তাহা বলিয়া প্রকাশ করিবার নয়। এক কথায় ভগবান জাগ্রত জীবন্ত। যে তাঁহার শিশু সন্তান হইতে পারে, তাহার অন্তর বাহিরে কোন অভাব থাকে না। প্রথম পিতা আমার অহঙ্কারের বিনাশ করিয়াছেন। কি বলিব—এই অহঙ্কারের বিনাশ জন্য কি যাতনা না আমি পাইয়াছি। এরূপ দিন গিয়াছে, এই স্থানে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছি। ভগবানের নাম লইতে গেলে, অশ্লীল ভাষা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত। আমি যতই চেষ্টা করিতে যাইতাম, ততই আরও খারাপ হইতাম। এক কথায়, আমি একেবারে বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছিলাম। সমস্ত কেব্‌দানি ছাড়িয়া দিয়া যতই পিতার চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে পিতা দিতেছেন, ততই দিন দিন যেন পিতা আমাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর রাজ্যে উঠাইয়া লইতেছেন। কিন্তু শিশু হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাঁহার অপার কৃপা ভিন্ন এই প্রকার হয় না; কারণ এক দিন আমি ভগবানের চরণে পড়িয়া কাঁদিতেও পারি নাই;—কাঁদিতে গিয়াছি, কে যেন হৃদয়ের মধ্য হইতে বিকট হাসি হাসিয়াছে। প্রার্থনা করিতে গিয়াছি, মুখ দিয়া অশ্লীল কথা বাহির হইয়াছে। এ সকল বলিবার এখন সময় নাই। জাগ্রত জীবন্ত পিতার কথা—যদি কখনও আদেশ গ্রহণ করিতে পারি—প্রতি দ্বারে বলিব। এখন

দয়াময়ের কৃপায় আমি আর ইহলোকবাসী নই,—পরলোকবাসী। আমি পিতার চরণে ডুবিয়া রহিয়াছি। শাস্ত্র মিথ্যা নয়। আমি পিতার চরণ হইতে স্বতঃই যাহা পাইতেছি, শাস্ত্রের সহিত তাহা মিলিয়া যাইতেছে। গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, বাইবেল পড, অতি পবিত্র সত্য সকল লিখিত রহিয়াছে। গীতার ন্যায় রত্ন পৃথিবীতে আর নাই। মানব জীবন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি এই রত্নে বঞ্চিত, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর নাই। গুরু গ্রহণ না করিয়া যে এই পথে যায়, তাহাকে বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বাহ্য জগতের ন্যায় ইহার নিয়ম আছে. সদ্গুরু তাহাই প্রদর্শন করেন। যদি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় কাঁদিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোন অভাব হয় না। যে মন, চিত্ত এবং বুদ্ধিকে তোমরা জ্ঞান বলিয়া থাক, তাহা জ্ঞান নয়। জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক সম্পত্তি। এই তিনের বিনাশ আছে,—জ্ঞানের কখন কোন অবস্থায় বিনাশ নাই। এই তিন জড়ীয় গুণ। জ্ঞান ভগবানের অপার কৃপায় উৎপন্ন হয়। এই সকল তোমাদের জানাইতে গেলে, একখানি পুস্তক লিখার প্রয়োজন। আমার সময় এখন বড় মূল্যবান, তাই বলিতেছি, ভাই, ক্ষমা করিও। সময় নষ্ট এক মুহূর্ত্ত করিও না। যদি সে ধনে পাইতে চাও, তবে অবিচ্ছেদে তাঁহাকে ডাক। আমি বলিতেছি, নিশ্চয় তিনি দেখা দিবেন। কেবল মাত্র সত্য লাভ করিতে গিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। এ সমস্ত এখন আর কিছু বলিবনা—জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত বলিব।”

"অহঙ্কার"

"শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণের মূর্ত্তি কল্পনা না করিলেও উপস্থিত হয়। জড়কে নিগ্রহ না করিলে কখনই আত্মা পরিস্ফুট হইবে না। প্রাণায়াম না হইলে মন ঠিক হয় না। মন জড়ীয় গুণ। জড় বশীভূত না হইলে, মন ঠিক কখনও হইবে না। এই নিমিত্তই আসন এবং প্রাণায়াম দরকার সর্ব্ব প্রথমে।”

"ইহাকে * বলিয়া দিন, অর্থ না বুঝিয়া যেন কিছু না করে। অর্থ না বুঝিয়া গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি জপ করিলে কোন ফল নাই। হিন্দি টীকা সহিত একখানা গীতা এবং একখানা ব্রাহ্মধর্ম্ম সংহিতা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কোন বন্ধুর নিকট হইতে আনিয়া দিলে উপকৃত হয়।”

"চাৎকার করিয়া কাল স্বপ্ন দেখিতেছিলে। এ প্রকার করিলে যোগ হইবে না। ধ্রুবের ন্যায় না হইলে ভগবান মিলেনা। সমস্ত ছাড়িয়া দশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া জীবন লাভ করিয়াছেন এবং গুরু গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, সকলের এক নিয়ম নয়। প্রকাশিতের মধ্যে যাহারা অতি উচ্চ তাহারাই দেবতা-শরীরধারী। বুদ্ধদেব অবতার বলিয়া গণ্য,—সর্ব্বভূতেই ভগবানেরই প্রকাশ।—তবে গুরু গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করা উচিত। বিজয় গোঁসাইকে তোমরা হেয় মনে করিও না। তুমি দেশে যাইয়া তাঁহাকে আপনার বিষয় সরলভাবে জানাও।—রাস্তা বুঝিবার সুবিধার জন্য। যে ব্যক্তির ভগবান ভিন্ন পুস্তকপাঠ পর্য্যন্তও, এমন কি ধর্ম্মপ্রসঙ্গ পর্য্যন্তও ভাল লাগে না, সে ব্যক্তির পক্ষে গুরু গ্রহণ না করিলে চলে;—যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি। সকল দিক ঠিক রাখিয়া চলিতে হইলে, কাজেই,

* এক ব্রাহ্মণ। বোধ হয় মৌনীবাবার সেবার্থী।

নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতে হইবে। সমস্ত ছাড়, দিনরাত্রি তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদ। গুরু আবশ্যক হইলে তিনি দিবেন; জ্ঞান আবশ্যক হইলে তাঁহার চরণ হইতে পাইবে। গৃহীর পক্ষে গুরু গ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য। তবে তাঁহার চরণে পড়িয়া থাক, কিন্তু সংসার ঠিক রাখিয়া চলিবে না।"

ইহার পর ভক্তিভাজন আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ওঁকারনাথে গমন করেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর মৌনীবাবা তাঁহার গীতার অলিখিত অংশে যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা গেল।—

"দয়াময়ের অপার করুণা লাভ করিয়াছি। যদি বাস্তবিকই মরিয়া কেহ বাঁচিয়া থাকে, তাহা আমার হইয়াছে। বহির্জীবনের তো কথাই নাই। আমার শরীর সম্পূর্ণ অবশ হইয়াছিল। সম্পূর্ণ রূপে যদি কেহ ভগবানের শিশু হইতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের হইয়া যাওয়াই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম।"

"তর্ক যুক্তি করিয়া কতকগুলি মত এবং বুদ্ধিগড়া সত্য অবধারণ করা হইয়াছে—যাহা জ্ঞান এবং ভক্তির নিকট স্থান পায় না।"

"এখন যদি পিতা আহার দেন, আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিব। তাহার পর পিতার চরণ পূজায় রত হইবার ইচ্ছা।"

"আর নিদ্রার দরকার কি?"

"সত্যং শিবং সুন্দরং" কখন কখন জপ করি। 'ওঁ হরি'ই আমার মূল মন্ত্র।"

"এখানে এক সাধু ছিল।"

"যদি পিতা কখনও দিন দেন, আপনাদের চরণের দাসানুদাস হইব। আপনাদের সঙ্গ দেবতাগণ বাঞ্ছা করেন,—আমি কি তুচ্ছ।"

"মনস্থির সম্বন্ধে কি বলিব? মানুষের মুখাপেক্ষী কোন বিষয়ের জন্যই হইবেন না। ইচ্ছা এবং দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঠিক ভগবানের কচিখোকা হইতে হইবে। আলস্য ধর্ম্মজীবনের যে প্রকার শত্রু, এ প্রকার আর নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আলস্যকে প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মলাভ কখনই হইবে না। এই আলস্য, যাহা সর্ব্ব-দুঃখের মূল, তাহা পরিত্যাগের জন্য আসন-সিদ্ধি দরকার। প্রাণায়ামও একটী বাহিরের উপায়; কিন্তু অহেতুকী ভক্তি ভিন্ন সকলই পণ্ড। অসত্য পরিত্যাগ অতি প্রয়োজন। স্বপ্ন পরিত্যাগ না করিলে ভগবান লাভ অতি কঠিন।"

"আমি মন এবং বুদ্ধির অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি। জ্ঞানের তত্ত্ব অতি অল্পই পাইয়াছি; সুতরাং মিথ্যা বলিবার ভয়ে (বাক্য, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা নির্দ্ধারিত বাক্য ঠিক নয়) তাহা বলিয়া মিথ্যাবাদী হইতে আর ইচ্ছা নাই। কর্জ্জকরা কথা অনেক বলিয়া আত্ম-নষ্ট হইয়াছে। মন এবং বুদ্ধি লয় হইলেই জ্ঞানলাভ করিব; তখন নিশ্চয়ই সত্য বলিব।"

"ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া কার্য্য করাকে আমি দোষ মনে করি না। কিন্তু অহঙ্কার নামক মহাশত্রু বিনাশ না হইলে ফলাকাঙ্ক্ষা দূর হইবে না, জ্ঞান লাভ হইবে না।"

"আপনার কি উপদ্রব?"

"চৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা প্রেমিক না হইতে পারিতেছেন, যাঁহাদিগকে অভ্যাসের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই গুরু গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা ভগবানের শিশু হইয়া প্রতিনিয়ত কাঁদিতে পারেন,

তাঁহাদিগকে আর অন্য কিছুই করিতে হয় না; ইহা আমি খাঁটি বুঝিয়াছি।"

"এক দুই মাস পরে কতক স্নান করি।"

"আমার নয়—আমার শারীরিক দুঃখের মধ্যে স্বপ্নমাত্র আছে। আশা করি, ভগবানের করুণায় অতি শীঘ্রই খাঁটি হইতে পারিব।"

"দেবী বাবু কি আছেন? নবদ্বীপ বাবু এবং হেরম্ব বাবু কি আছেন?"

কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিষয় লিখিলেন—

"প্রচার করিয়া আত্মনষ্ট না করিয়া, কোনরূপ কার্য্য করিয়া জীবন লাভ করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের এখন উচিত।"

পূজনীয় আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৌনীবাবাকে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন,—"বুদ্ধদেবের ন্যায় জীবন্ত সাধক দেখিয়া আসিলাম। পুস্তকে বুদ্ধের কঠোর তপস্যার কথা পড়িয়াছিলাম, এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম।" মৌনীবাবাও সাত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন।

ওঁকারনাথ অবস্থান কালে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মৌনীবাবা একবার মাত্র সহরে গিয়াছিলেন। এক জন্মাষ্টমীর মেলায় তাঁহাকে পাল্কীর ন্যায় এক প্রকার যানে উঠাইয়া সকলে মিলিয়া বহন করিয়া সহর পরিভ্রমণ করাইয়া আনিয়াছিল। এই দিন সহর শুদ্ধ লোক এবং যাত্রীগণ তাঁহার প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সকলে তাঁহাকে জোর করিয়া যখন যানে তুলিয়া লইল, তখন তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি করিয়া সকলে টাকা, পয়সা, কড়ি ছড়াইতে লাগিল। প্রায় আড়াই মাইল পথ এই প্রকার মিছিল হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাহকগণ তাঁহাকে গুফায় ফিরাইয়া দিয়া গেল।

মৌনীবাবা ওঁকারনাথে পাঁচ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে দুখানি মাত্র পত্র লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম পত্র খানি হারাইয়া যায়; দ্বিতীয় পত্রের নকল নিম্নে দেওয়া হইল, ইহাই তাঁহার শেষ পত্র। মৃত্যুর তিন চারি মাস পূর্ব্বে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"প্রাণের ভাই,

তুমি যে ভাব পাইয়াছ, তাহা সত্য; কিন্তু 'সমর' কথাটা কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অসত্যের সহিত সংগ্রামকে তুমি 'সমর' বলিয়াছ। আমি তো সেই অসত্য জীবন সমূলে উৎপাটন করিয়া সত্যরত্ন লাভ করিবার জন্য জীবন অর্পণ করিয়াছি। তবে আর তোমার ন্যায় ভাই আনন্দ না করিয়া দুঃখ কেন করিবে? অসত্য এই মন এবং ইহার কার্য্যাবলী, (মন অর্থ চিত্ত, সন্দিহান বৃত্তি, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি) বুদ্ধি অস্থায়ী, মিথ্যাবাদী এবং পরিবর্ত্তনশীল; কারণ ইহার মূলে মন মহাশয় বিরাজ করিতেছেন। স্বপ্ন প্রভৃতি মনেরই কার্য্য। আমার সহিত মিথ্যাবাদী, অস্থায়ী বুদ্ধি মহাশয়ের যোগেই অহঙ্কারের সৃষ্টি। বুদ্ধি মহাশয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেই জ্ঞান-রত্ন লাভ হয়; কারণ অসত্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মাকে মুক্ত না করিলে সত্য স্বরূপ নিরঞ্জন পুরুষকে লাভ করিবার আশা বাতুলতা মাত্র। জ্ঞান চিরস্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিষ্কলঙ্ক। জ্ঞানীর নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এক; ইহকাল, পরকাল এক এবং সর্ব্বভূত চরাচর এক। জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। অসত্য হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণ রূপে

মুক্ত না করিলে, ভগবানের কচিখোকা হওয়া যায় না। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; কারণ সত্য অসত্য অবধারণ আমি কিরূপে করিতে পারি? যদি জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের আদেশ লাভ করিবার ক্ষমতা হয়, তবেই আমাকে দেখিতে পাইবে। আমি দয়াময় পরাৎপর পরমগুরুর অতিশয় কঠিন শাসনে এই জ্ঞান-রত্ন লাভ করিয়াছি যে— "আমি তুমি কেহই কিছু নয়, সকলেই তাঁহারই প্রকাশ। আমরা সকলেই তাঁহার লীলাক্ষেত্র। তিনি হৃদয়ে বসিয়া যাহাকে যে ভাবে চালাইতেছেন, সে-ই সেই ভাবে চলিতেছে। কেহই পাপী পুণ্যাত্মা নাই। বুদ্ধির সহিত আত্মার যোগেই লোককে বৃথা অহঙ্কারে মত্ত করিয়াছে এবং নানা প্রকার বৃথা উপাধির সৃষ্টি করিয়াছে।

দয়াময় অপার করুণা করিয়া আমার সমস্ত উপাধি বিনাশ করিয়াছেন। আমি এবং আমার এখন কিছুই নাই। সমস্ত জগতই সেই একমাত্র পরাৎপর পরমাত্মার প্রকাশ। আমার এখন কোন সমাজ নাই, জাতি নাই, কুল নাই, মান নাই, অপমান নাই এবং ঘৃণা ও আদর, কিছুই নাই। আমার নিকট সমস্ত সমাজ এবং সর্ব্বলোক এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার শত্রু নাই, মিত্র নাই; আমার ভাই, ভগ্নী, পিতা, মাতা, কিছুই নাই। এক ব্রহ্মই সর্ব্বভূত চরাচরে সুন্দররূপে জাগ্রত জীবন্তরূপে প্রকাশিত। আমি কাহাকে আপনার এবং কাহাকে পর বলিব এবং কাহার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিব? এখন সর্ব্বজীবে এবং সমস্ত লোকে আমার সমভাব এবং অতি পবিত্রভাব। আমার মস্তক শঙ্কর, কৃষ্ণ এবং যীশু প্রভৃতি মহাত্মাগণ হইতে একটী কীটাণুকীটের নিকট অবনত। আমার অন্তরাত্মা দয়াল হরি প্রকৃত পক্ষে এবং ভক্তির সহিত অবনত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। এখন আমি সর্ব্বলোক সহিত সেই অখণ্ড অব্যয় পুরুষকে মস্তকে ধারণ করিতেছি। এখন আমি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম পাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ব্রাহ্ম, আমার নিকট এক হইয়াছে; পাপী এবং পুণ্যাত্মা এক হইয়াছে। আহা! আমার অন্তরাত্মার দয়াল হরির কতই দয়া। আমি ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা উপাধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া আমাকে তাঁহার কচি খোকা করিয়াছেন। এখন কাহারও নিকট কিছু চাহিতে এবং জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। দয়াল হরি আপনা আপনি প্রার্থনা বিনা সকল বিধান করিতেছেন এবং সংসার হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আমি বিপথে যাইতে চাহিলেও আমাকে ফিরাইয়া আনিতেছেন। দেখ, দয়াল হরির অপার করুণা! আমি এখানে আসিয়াই কিছুদিন পরে খরচের জন্য তোমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি প্রায় একমাস তোমাদের প্রেরিত টাকার আশায় ছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে পত্র ব্যারিং, তথাপি তোমরা পাও নাই। দয়াময় তোমাদের নিকট সেই পত্র না পৌঁছাইয়া যে কি উপকার সাধন করিয়াছেন এবং কি অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। জাগ্রত জীবন্ত দয়াল হরির অপার করুণা। হরি জাগ্রত জীবন্তভাবে আমার পিতা, মাতা, গুরু এবং সেবক হইয়া অপার লীলা দেখাইতেছেন। আমি প্রায় চারি পাঁচ মাস বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

এই ব্যাধির প্রথম অবস্থাতে আমি সম্পূর্ণ অবশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সর্পগতিতে চলিতাম, নিজের হস্তপদাদি পর্য্যন্ত এক প্রকার গতিহীন হইয়াছিল! সমস্ত শরীর যেন বরফে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল। হস্ত-পদ সকলই আছে, অথচ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিতে অক্ষম, নিজের অন্নগ্রহণে অক্ষম এবং শৌচাদি কার্য্য করিতে অক্ষম। বল দেখি, এই অবস্থা হইতে কে আমাকে এই বন্ধু-বান্ধবহীন নির্জ্জন স্থানে রক্ষা করিল? আমি অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়া দিতেছি—"আমার জাগ্রত জীবন্ত দয়াল হরি।" হরিই নিজ হস্তে আমায় অন্নপানাদি করাইয়াছেন এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৃষ্ঠে করিয়া এবং নানাপ্রকারে আমাকে বহন করিয়াছেন। তুমি হয় তো ব্যাধির তীব্রতা বুঝিতেছ না। আমি দয়াময়ের কৃপায় এক প্রকার মৃত্যু-ঘর হইতে ফিরিয়াছি। এই বাতব্যাধির উপর কাশী ও জ্বর ছিল। দয়াময় হরি অতি আদরের সহিত আমার সেবাশুশ্রূষা এবং চিকিৎসা করিয়াছেন। আমি তাঁহার কৃপায় এখন লাঠিতে ভর দিয়া থাপস্ থুপস্ করিয়া রামচন্দ্রপুরের কালীর ভাইয়ের ন্যায় চলিতে পারি। আশা করি, দয়াময় শীঘ্র আমাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিবেন। আমি পীড়িত হইলাম বলিয়া যখন অন্যান্য সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল, অন্যস্থান-নিবাসী এক ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া প্রভু আমাকে কত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইলেন। এই ব্যক্তির আহ্বানে এবং কাতর প্রার্থনায় স্থানীয় ডিস্পেনসারীর ডাক্তার মহাশয় আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত আমাকে চিকিৎসা করিতেছেন। এই ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে শুশ্রূষা করিয়াছেন, তাহা পিতা হইতে হয় না, মাতা হইতে হয় না, স্ত্রী হইতে হয় না, ভাই ভগ্নী হইতে হয় না এবং বেতন-ভোগী ভৃত্য হইতে হয় না। এই ব্যক্তি আমার নিকট কিছু আশা করেন না, কেবল আশীর্ব্বাদ-ভিখারী। আমার সেবা করিতে পারিলেন বলিয়াই সর্ব্বদা প্রসন্ন। ভাই, আমি কি বলিব, স্বয়ং হরি এই ব্যক্তির হৃদয়ে বসিয়া আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এই ব্যক্তি জমিদারী বাছারীর পেয়াদা ছিল, একটী স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাব দেখিয়া ইহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। এখন এক প্রকার সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্ত্রীর সহিত এখানে বাস করিতেছেন। যদি ব্যাধির প্রথম অবস্থায় তোমাকে জানাইতাম, তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্য এক শত দুই শত টাকা খরচ করিতে। তাহাতেও আমি আরোগ্য লাভ করিতাম কি না, সন্দেহ। আমি এক প্রকার আরোগ্য লাভ করিয়াছি, এখন আর তোমার আসি-বার প্রয়োজন নাই। আমার ভার হরির হাতে দিয়া সুখে থাক। আমি জ্ঞানলাভ করিলে এবং হরির আদেশ পাইলে, অবশ্যই আপনা হইতেই তোমাদের সহিত দেখা করিব; কিন্তু সংসারে আর বিষপান করি-বার জন্য যাইব না। দয়াময় হরি সংসার হইতে উদ্ধার হইতে তোমার দ্বারা আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার একটী কাতর প্রার্থনা এই—শীঘ্র সৎপথে সম্পন্ন হইবার জন্য তৎপর হও। আর আমাকে বৃথা পত্র লিখিয়া প্রয়োজন কি? হরিকে বিশ্বাস করিয়া আনন্দচিত্তে কাল যাপন কর। পিতামাতা এবং অনাথা আত্মীয়-গণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না। সময় সময় তাঁহাদের সহিত দেখা করিও, এবং

আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও, হরিলাভ পক্ষে যেন তাঁহারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন। কারণ সাধক-বাণী এই—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" গীতা এবং পাতঞ্জল দর্শন পাঠ কর, গুরুর অনুসরণ কর, শান্তি পাইবে।

আর আমাকে পত্র লিখিও না—উত্তর পাইবে না। কারণ আর এক মুহূর্ত্তও আমাকে হরির চরণ ছাড়াইয়া বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিও না।

* * * * *

ভগিনী কুমুদিনী এবং তোমার অধীনস্থ সকলকে গীতা পাঠ করাইবে এবং সদ্‌গুরুর অনুসরণ করাইবে। কুমুদিনীকে যদি সংসার হইতে বাহির করিয়াছ, সে যাহাতে সৎপথে সম্পন্ন জ্ঞানলাভ করে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। তাহাকে পুস্তক পড়া বিদ্যা এবং কার্য্য করা ধর্ম্ম দিয়া ক্ষান্ত হইও না। সে এবং মা মোক্ষ এবং অনাথা ভগিনীগণ যাহাতে জ্ঞানাপন্ন হইয়া তোমাদের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। যদি ভগবান আকর্ষণ করেন, অতি শীঘ্রই তোমরা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার জন্য ছুটিবে।

যদি পূজনীয় গুরু বিজয়বাবুকে একবার আমার দুঃখের কথা শুনাইয়া এদিকে পাঠাইতে পার, পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। আমি ভগবানকে সাক্ষী করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

এক আত্মন্! যদি তোমার অন্তরাত্মা এই ব্যক্তিকে * ঋণমুক্ত করিয়া প্রসন্ন হয়, তবে তাহার ঋণ শোধার্থ ২০৲ এবং পুস্তক ক্রয়ার্থ ১০৲ এইরূপ ভাবে পাঠাইবে যে সে যেন বুঝিতে না পারে, তুমি ইহার প্রেরণকর্ত্তা এবং আমি তাহাতে সন্তুষ্ট আছি। তাহার ঠিকানা—

Sree Ramjee Brahman,
c/o Babu Lachmi Narayan Seth,
Mandata.
Khandwa.

এই ব্যক্তি যেমন আমার সেবা করিতে পারিলেন বলিয়াই সুখী এবং দিনদিন রোগমুক্ত হইতেছি দেখিয়াই সুখী, তোমার অন্তরাত্মা যদি তোমাকে সেইরূপ সুখী করেন, তবে পাঠাইবে, নচেৎ নয়। তুমি যদি আমার কঠিন পীড়ার সময় একদিন ইহার কার্য্যাবলী দেখিতে, তবে দেবতা বলিয়া ইহার চরণে নত হইতে। ফলতঃ হরি এই ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া, আমার মা হইয়া মুখে অন্ন তুলিয়া খাওয়াইয়াছেন, আত্মীয়, ভাই, বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, নাপিতের কার্য্য করিয়াছেন, অবশেষে আশ্চর্য্যরূপে মেথরের কার্য্য করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, এই ব্যক্তি বিন্দুমাত্রও ইহার কর্ত্তা নয়, সেই হৃদয়বিহারী দয়াল হরিই ইহার কর্ত্তা।

আমি এত লিখিলাম বলিয়া মন ও বুদ্ধি মহাশয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া আমার কোন motive আছে বলিয়া মনে করিওনা। আমার তোমার নিকট কিম্বা অন্য কাহারও নিকট পত্র লিখিতে ইচ্ছা ছিল না, কেবল আমার সম্বন্ধে তোমার ভুল সংশোধন করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। আমি সংসারে ফিরিব বলিয়া যে আশা মনে ধারণ করিতেছ, তাহা মিথ্যা। বৃথা অর্থব্যয় ও কষ্ট করিয়া আর আমাকে দেখিতে আসিও না। হরিকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাক।

* পূর্ব্বোক্ত সেবক ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বশেষে, এই ব্যক্তিকে টাকা পাঠাইলে নোট রেজেষ্টারী পত্রের মধ্যে ভরিয়া পাঠাইবে এবং দেবনাগর অক্ষরে কেবল এই কথা লিখিবে—"ঋণ শোধ দেনা" এবং "পুস্তক কেন্‌না।"

নির্ব্বাণ।

ওঁকারনাথ গমনের পাঁচ বৎসর পরে মৌনীবাবা একদিন কথা কহিলেন। সকাল বেলায় তাঁহার মিঠাই-বিক্রেতা সেবক ও তাহার পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা আমার মা বাপ, আমার দোষ তোমরা ক্ষমা কর। তোমরা আমার বড় উপকার করিয়াছ। আমাকে ইচ্ছামত সেবা করিতে পার না বলিয়া তোমরা দুঃখ কর। আজ তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমাকে আনিয়া দাও, আমি খাইব।"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি খাইবেন?" মৌনাবাবা বলিলেন—"খিচুড়ী করিয়া আন।"

মিঠাই-বিক্রেতা পত্নীসহ খিচুড়ী আনিতে গেল। আসিয়া দেখে, মৌনীবাবা সমাধিস্থ। খিচুড়ী লইয়া তাহারা মৌনীবাবার ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল, তাঁহার ধ্যান আর ভাঙ্গিল না। তাহারা বুঝিল না, মৌনীবাবা মহাসাধনান্তে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার এ সমাধি আর ভাঙ্গিবার নয়। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় পুত্রশোকাতুর জনক জননীর ন্যায় তাহারা কাঁদিতে লাগিল।

বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া নর্ম্মদাতীরে প্রস্তর মধ্যে মৌনীবাবার দেহ সমাধিস্থ করিয়া আসিল। এদিনও ওঁকারনাথে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল। স্থানবাসী আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে মৌনীবাবার গুহায় আসিয়া তাহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান দেখাইলেন। পাঁচখানি বৃহৎ নৌকা সুসজ্জিত করিয়া শব বহন করিয়া সমাধি ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। পঁচিশখান কাপড় ও পাঁচমণ মালপুয়া বিতরিত হইল, এবং মৌনীবাবার নামে মুহুর্ম্মুহু জয়ধ্বনি উঠিয়া ওঁকারনাথকে কম্পিত করিয়া তুলিল।

তথাকার লোকদের বিশ্বাস যে, যথার্থ সাধুব্যক্তির মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার পর দিনই সমাধিস্থান নর্ম্মদা-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পরদিন দেখা গেল, নর্ম্মদার জল বৃদ্ধি হইয়া মৌনীবাবার সমাধিস্থান আপন বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়াছেন, * জলরেখা সমাধি স্থান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়াছে।

আটত্রিশ বৎসর বয়সে মৌনীবাবা নির্ব্বাণ লাভ করেন। সাত বৎসর মহাসাধনার পর যে জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মহৎ ফল তাঁহার দুঃখিনী জন্মভূমিকে, জগতকে দান করিবার অবসর পাইলেন না। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

এইরূপে, নব্যভারতের এক মহা সাধক, গোপনে আসিয়া, গোপনেই জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া গেলেন। ফলবাদীরা ফলাফলের বিচার করুন। আমরা অনুভব করিতেছি, তাঁহার জীবন আমাদের মহোপকার সাধন করিতেছে। যখন হিংসা, দ্বেষ, বিলাসিতা প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া সমাজকে বিকৃত করে, তখন সাধুগণ সমাজের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আত্মবলিদান করেন। সকল দেশে এবং সকল কালেই এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাব, তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার

* মৌনীবাবার দেহান্তে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওঁকারনাথে গমন করিয়া ইহা শুনিয়াছিলেন।

ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয় নাই। সমাজের যে বহির্ম্মুখীনতা ও রাজসিকতা দেখিয়া তাঁহার সাধু আত্মা অস্থির হইয়া বৈরাগ্যানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিল, সমাজের সে পাপ আর অধিক দিন থাকিবে না। ধর্ম্মপ্রাণ, বৈরাগ্য-প্রবণ ভারত জগৎকে আবার তাঁহার সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবেন। সাধু প্যারীলালের আকুল প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার মুক্ত আত্মা দেবলোক হইতে দেখিবেন "ভারতের গৃহ, ভারতের বন, গিরি আবার পুণ্যময় তপোবন হইয়াছে,—ব্রহ্মলাভ করিয়া ভারত স্বাধীন হইয়াছেন।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

বাঙ্গালার সংবাদ পত্র চর্চ্চা। (২)

অনেক প্রাচীন ব্যাপার লুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং ইতিমধ্যেই অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠা অন্তর্হিত হইয়াছে।

কফি-শালগমের ন্যায় অনেক নূতন পদার্থ চকিতনেত্রে ধীরে ধীরে এই ভগ্ন-ভিত্তি প্রাচীন সমাজ-দুর্গের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতেছে। নূতন যুগের সকল অতিথিই দুর্গাভ্যন্তরে সমান সম্ভাষণ পায় নাই। কাহাকে হয়ত প্রহরীর তর্জ্জনে সিংহদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে, কেহবা ছদ্মবেশে, কেহবা উৎকোচের দ্বারা, কেহবা বাহুবলে ভিতরে ঢুকিয়াছে। বাহুবলে যাহারা গিয়াছে, তাহারা এখনও উপবেশনের স্থান পর্য্যন্ত পায় নাই।

অনেকে কিছু হাওয়ার ভিতর দিয়া বা আহুত হইয়া প্রবেশ করিয়াছে। সুবিধার তাড়নায় এইরূপে নানা নূতন সখা দুর্গাভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তন-বিপ্লব আমাদিগকে নিবিড় ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং সমাজ-দেহের মাঝে নূতন অতিথি-সম্প্রদায় যাহাতে সহজভাবে প্রাচীন, অনাদৃত এবং সময়ের ঘূর্ণিবাত্যায় কক্ষভ্রষ্ট ও হীনপ্রভ পেন্সনার-গণের স্থান অধিকার করিতে পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই নব-সম্প্রদায়কে সমগ্রভাবে প্রাচীন কর্ত্তব্যগুলিকে স্কন্ধে ধারণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সূচনা হইয়াছে অল্পকাল, তৎপূর্ব্বে ইহা ছিল না, এমন নহে, থাকিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ইহা মুদ্রাযন্ত্ররূপী মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণ। প্রভেদ এই যে, রামায়ণের মহীরাবণের মাত্র একটী দিগ্বিজয়ী পুত্ররত্ন ছিল, কিন্তু এই মুদ্রারাক্ষস কত পুত্ররত্নের অধিকারী, গণনা করা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী ব্যাপিয়া নগরে নগরে ইহার লৌহ-উদর হইতে অঙ্কিত হইয়া ইহারা হরিনামাঙ্কিত বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় সকলের ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিতেছে ও বহির্বাবরণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

দেখা যাইতেছে, এই স্বল্পসময়ে আমাদের সমাজ-অঙ্গে সংবাদপত্রগুলি ধীরে ধীরে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছে। এইটী এমন গুরুতর কাজ যে, কেহ উদাসীন হইয়া এতৎসম্পর্কে আলোচনা করা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। লোকশিক্ষার স্বাস্থ্যের

উপর সমাজস্বাস্থ্য নির্ভর করে—সংক্ষেপে ইহাই সমাজের মেরুদণ্ড। যদি প্রতীচ্য সমাজের কার্য্য-কলাপ, আচার-আকারে এবং আমাদের ক্রিয়া-কৃত্যে কোন বৈষম্য দেখা যায়, বলা অনাবশ্যক, তাহা এতদুভয়ের শিক্ষার ধর্ম্মগত বৈপরীত্যে সম্ভব হইয়াছে। কাজেই অতি সংক্ষেপে সংবাদপত্রগুলি জাতীয় সমাজ-দুর্গে কোন্ স্থান অধিকার করিতে যাইতেছে, আলোচনা করা যাক্।

লোকশিক্ষা-কার্য্যে ভারতে মৌখিক-শিক্ষার চিরকাল একাধিপত্য ছিল। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য কথোপকথনের ছাঁচে ঢালা। এসিয়াব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম-বিপ্লব, ভারতব্যাপী শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, চৈতন্তের ধর্ম্ম-বিপ্লব প্রভৃতি যাবতীয় বিচার্য্য ভাব-বিপ্লব মৌখিকভাবে বিস্তৃত হইয়াছে—আক্ষরিক উপায়ে এই বিরাট-বিস্তৃতি সম্ভব হইত না। রামায়ণ মহাভারত পাঠ, পূজাবসানে চণ্ডী প্রভৃতি পুঁথি পাঠ, গীতা-পুরাণ পাঠ, কথকতা ব্রতাপারণার পুঁথি শ্রবণ প্রভৃতি ভারতে ধর্ম্মকৃত্যে ও সমাজকৃত্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আক্ষরিক-শিক্ষা-বিহীন কৃষকেরাও রামায়ণের মধুর চরিত-শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হয় নাই এবং এইজন্ত এখানকার জনসাধারণ উরোপীয় পাশব-প্রকৃতিরূপী পুতনার আলিঙ্গন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ভারতের গ্রামে গ্রামে এই সুমধুর প্রাচীন-কাহিনীর গীত-রেখা যে স্নিগ্ধ-বিতান রচনা করিয়াছিল, নানা উৎপাত অত্যাচারের কণ্টক আবর্ত্তের মাঝেও ভারতের প্রাণ উহারই স্নিগ্ধছায়ায় নিজের শঙ্কিত-কম্পিত প্রাণের বেপথু গোপন রাখিয়াছিল এবং উহারই মোহন আকর্ষণের মাঝে নিবিড় গোপন-ক্রন্দন ভুলিয়া গিয়াছিল।

এদেশে শিক্ষাকার্য্যটী কখনও পণ্যদ্রব্য রূপে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহার বাণিজ্য বা ক্রয় বিক্রয়, কল্পনার বহির্ভূত ছিল। আমাদের দেশকলেবর যেমন বিরাট, দেশের হৃদয়ও তেমন বিরাট ছিল। আমাদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কখনও দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে হয় নাই—সর্ব্বত্র আতিথ্যের উন্মুক্ত আহ্বান ছিল। দেশের আচারে ব্যবহারে, দরবার মজলিসে,সাহিত্যে-চিত্রে সর্ব্বত্র একটা বিরাট হৃদয়বত্তার নিদর্শন ছিল। ভারতের মন্দির বা মস্‌জিদের চতুষ্কোণে কখনও কোথাও প্রহরীর স্থান ছিল না।

কাজেই লোকশিক্ষা অতি সহজে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। বিনাব্যয়ে তখন সম্পদের সময়ও শিক্ষালাভ হইত। আজ এই ঘোর দারিদ্র্য-দুর্দ্দিনেও নূতন প্রণালীর বর্ত্তমান সভ্যতার কৃপায় শিক্ষাকার্য্যটী পণ্যদ্রব্য রূপে ব্যবহার্য্য হওয়ায়, শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দরিদ্র জনসাধারণ শিক্ষার সুবিধা ততটা পাইতেছে না। শিক্ষার মৌলিক সনাতন প্রাণ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার বাহিরের আবরণটীকে আধুনিক সুধীগণ মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায় বিঘূর্ণিত করিয়া অমৃতমরীচিকা সংগ্রহ করিবার জোগাড় করিতেছেন। ইতিমধ্যেই ফলের আস্বাদ পাওয়া গিয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে উপরোক্তভাবে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়ে সরস্বতী দেবী খরচের তালিকা এক হস্তে এবং অন্য হস্তে বিলাতী-শিক্ষার ভোজবাজী হাতে লইয়া উপস্থিত হইতেছে। এই ভেলকির কৃপায় মানুষ মেষে পরিণত হইতেছে এবং কখনও বা মেষশাবক মানবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—ভাবের প্রচার এবং

বিস্তৃতির প্রশ্ন ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে। কয়েকটা হস্তকৌশল কিম্বা বাক্যজাল কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। বীণার ঝঙ্কারে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না—কিন্তু শুভ্র মরালরূপী কলিকাতা গেজেটের চানাপুটি সঞ্চালন-রবে বক্ষপঞ্জর সহসা গুঞ্জন করিয়া উঠে।

দেশে এখনও ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে মৌখিক শিক্ষার আদান প্রদান হয়, কাজেই মোটামুটী এক রকমের শিক্ষা সকলেই পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু সে শিক্ষা রামায়ণ মহাভারতের বা কোরাণ-হদিসের, বর্ত্তমান সভ্যতার নবপ্রসূত ইতিহাস ভূগোলের নহে। এই নবশিক্ষা পাইতে হইলে পয়সা খরচ করিতে হইবে।

স্কুল কলেজ ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে সংবাদপত্রে একশ্রেণীর শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। অনেকস্থলে ইহার উচ্চকোলাহল, যাবতীয় সমগ্র কলরব নিঃশব্দ করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর শিক্ষা আমাদের সমাজকলেবরে নূতন অতিথির ন্যায় উপস্থিত হইতেছে—নগর এবং উপনগরে মোটামুটী ইহা কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—গ্রামে ততটা পারে নাই। সে পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে।

সংবাদপত্র যে মুহূর্ত্তে লোকশিক্ষার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সে মুহূর্ত্তে দেশের শিক্ষাপ্রণালীর সনাতন প্রকৃতি চর্চ্চার প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্র বিনামূল্যে বিতরিত হয় না এবং উহাতে লেখক ও পাঠকের হৃদয়-সম্বন্ধ ঘনাইয়া তুলিবার সর্ব্বপ্রকার পথ বন্ধ করা হয়। ভারতীয় সনাতন-প্রণালীর সহিত মূলেই এই সংঘর্ষ উপস্থিত, দেখা যাইতেছে।

বাঙ্গালা দেশের ভট্টসম্প্রদায়, বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর দল এক সময় সংবাদপত্রের স্থল অধিকার করিত। তাহারা পল্লীতে পল্লীতে নানা বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইত। এসব ছাড়া বিবাহের বৈঠকে এবং প্রাঙ্গণে আধ্যাত্মিক জগতের আলোচনা ছাড়া, ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে এত অত্যধিক পরিমাণ চর্চ্চা হইত যে, বর্ত্তমান সময়ের নিষ্প্রভ মজ্‌লিস্‌ এবং আহারকালের পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত সময়কর্ত্তনের কৌশল অস্ত্র স্বরূপ কথাবার্ত্তার জীবনহীন উদ্যম দেশের অভিজ্ঞ অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কাজেই যে নূতন স্থল ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, তদুপযোগী সার্টিফিকেট ইহার নাই—এই জন্য সাতকোটি বাঙ্গালী অধ্যুষিত বাঙ্গালা দেশে কোন পত্রিকা ত্রিশ চল্লিশ হাজার, এমন কি পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। দেশে লিখিত বা মুদ্রিত শিক্ষা তেমন ভাবে প্রচারিত হয় নাই—মৌখিক শিক্ষাই চিরকাল আদৃত হইয়া আসিতেছিল। এই জন্য সংবাদ পত্র জাতীয়-হৃদয়ে এখনও প্রশস্ত আসন লাভ করে নাই। বিনা ব্যয়ে যাহা চিরকাল পাওয়া যাইত, তাহা লাভ করিতে নূতন টেক্স দেওয়ার প্রবৃত্তিও এখনও সম্যক্‌ জাগরূক হইয়া উঠে নাই। এজন্য ভারতের হৃদয়চিত্রশালায় সংবাদ পত্রের ছবি স্পষ্ট হইয়া মুদ্রিত হইতে পারে নাই। ইহার ক্রোধ কিম্বা ক্রন্দনের মূর্চ্ছনা, হাস্য কিম্বা পরিহাসের শৃঙ্গচূড়া বিরাট সমাজ-দুর্গের শুভ্র শ্বেতমর্ম্মর-খচিত সিংহদ্বার হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এই কারণে পল্লী জীবনের সারল্যের মাঝে সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মহীয়ান পুরুষগণ

এখনও রাজত্ব করিতেছেন—আমাদের কেকারব এবং করতালি যে রাগিণী সৃজন করিতেছে, তাহা সহজ ভাবে প্রসারিত না হইয়া সামাজিক বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে।

জন সাধারণের হৃদয়-রাজ্য দখল করিতে হইলে মূল্য হ্রাস করিতে হইবে এবং আক্ষরিক শিক্ষার বিস্তারও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কারণ সংবাদ পত্রের ক্ষমতা ইহার প্রচারের উপর নির্ভর করে—গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। পরে এইটুকু বলা প্রয়োজন, সম্পাদকের দলের মাঝে সংশিক্ষা এবং উপযুক্ত "কাল্‌চার" না থাকিলে লোক শিক্ষার প্রশ্নই উঠে না। এই খানে কোন অভিজ্ঞ ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতেছি না :—

"The development of the modern newspaper is due to a union of causes that may well be termed marvellous. A machine that from a web of paper 3 or 4 miles long can in one hour print, fold, cut and deliver 24,000 or 25,000 perfected broadsheet is after all not so great a marvel as is the organizing skill which centralises in a London office telegraphic communication from every important town in Europe, Asia, Austria and Australia and which then, while transmitting shelter the news of London, distributes those communications to thousands of recipients simultaneously by day and night throughout all Britain. *And but for unusual mental gifts conjoined with high culture and with great staying power* in the editorial rooms, all these marvels of ingenuity—which now combine to develop public opinion on great public interests and to guide it—would be nothing better than *a vast mechanism for making money out of man's natural aptitude to spend his time either in telling or in hearing some new thing.*"

নানা স্বাধীনরাজ্যে আক্ষরিক শিক্ষা এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, অতি সহজেই সংবাদ পত্র দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এজন্য তাহা অনেক সময় 'চা'র ন্যায় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় আয়তনে ক্ষুদ্র ভূখণ্ডেও দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ছড়াছড়ি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। লণ্ডনে "Times","Morning Post""Daily news" "Standard," "Daily Telegraph" প্রভৃতি বিখ্যাত প্রভাত-পত্র এবং "Globe","Evening Standard","St James's Gazette," "Evening News","Pall mall Gazette," "The Echo" প্রভৃতি বিখ্যাত সান্ধ্য-পত্রিকার প্রচার দেখিয়া স্তব্ধ হইতে হয়। তিন চারি লক্ষ গ্রাহক এই সমস্ত কাগজের পক্ষে বিস্ময়জনক ব্যাপার নহে। তদুপরি দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজ যেখানে রাজধানীর সম্পত্তি মাত্র নহে—প্রায় দুই শত দৈনিক কাগজ ইংলণ্ডের মফঃস্বল হইতে বাহির হইতেছে—সাপ্তাহিক পত্রের ত কথাই নাই। বলা আবশ্যক, ফ্রান্স ও জর্ম্মনী এবং বর্ত্তমানের জাপান সম্বন্ধেও উপরোক্ত উক্তি খাটে।

আক্ষরিক শিক্ষালব্ধ সাধারণের সংখ্যা অনুপাতে নিতান্ত সামান্য, সন্দেহ নাই। তবুও ইহাদের মধ্যে যাহাতে সংবাদ পত্রের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নপর হওয়া প্রয়োজন। এবারই যথার্থ ঘরের কথায় আসিয়া পৌছিয়াছি।

এক্ষেত্রে প্রথম কণ্টকই হচ্ছে মূল্যাধিক্যতা। জনসাধারণের আয় এবং অবস্থা বিচার

করিতে হইবে এবং কি উপায়ে স্বল্প মূল্যে কাগজ বিতরিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। একটু বিচার করিলেই অনেক সুবিধা চোখের উপর পড়িবে। এ সমস্ত সুবিধা ত্যাগ করা ঠিক নহে। যবে

"রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণ শিখর রথে"—

তখন যদি মণিহার ছিঁড়িয়া তাহার পথের ধূলায় নিক্ষেপ না করি, শেষে দেশকে ধিক্কার দিয়া লব্ধ-সুযোগ অবহেলার প্রায়শ্চিত্তের ভার সাধারণের উপর অর্পণ করি, তবে তাহা বড় প্রশংসার কার্য্য হইবে না। এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিলে দেশের প্রাণ এবং প্রকৃতির সহিত যেন আমরা কলহ না করি।

আমাদের দেশের মূল সূত্রগুলি আমরা ধরিতেই চেষ্টা করি না। যে দেশের লোকেরা কথাবর্ত্তায় "হোম—নিউস্" বলিতে ইংলণ্ডের সংবাদ বোঝেন, তাঁহারা বুদ্ধি বৃত্তির সহিত কলহ করিয়াছেন, সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাহির হইতে দেশের অর্থ আকর্ষণ, ব্যক্তিগত আড়ম্বর ও ভোগ-লিপ্সার বিলাতী আদর্শ, অর্থের ঝঙ্কারে খ্যাতির দ্বার উদ্ঘাটন প্রভৃতি এই দেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নানা ব্যাপারে এ দেশের সাধারণের মধ্যে ভয়ানক অর্থাভাব ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সমাজ-রাজ্যে প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র পরিবারটীই ভালবাসা বা ভাবের আদান প্রদানের গণ্ডী না হওয়াতে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির জন্ত সামান্ত অর্থ মাত্র ব্যয় করিতে দেশ অভ্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পল্লীরাজ্যে সকলেরই অল্প বিস্তর দাবী-দাওয়া আছে, এজন্য প্রত্যেকে যাহা কিছু অর্জ্জন করে তাহা নিজের বক্ষপঞ্জরে লুক্কায়িত রাখিয়া সে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। বিবাহে—শ্রাদ্ধে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বা বাধ্য হইয়া ব্যয় করিয়া কপর্দ্দক শূন্য হওয়া আমাদের দেশে দুর্লভ দৃশ্য নহে। দেশে অর্জ্জনের পন্থা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহ বা শ্রাদ্ধের ব্যয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিবার উপায় নাই।

এজন্য দেশের উপর সাধারণের দিক হইতে নূতন টাক্স আদায়ের মতলব করিলে একটুখানি অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত ধনশালী লোক লক্ষ্য হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু উঁহারা যে কলেবরে সামান্য ভগ্নাংশমাত্র দখল করিয়া আছেন, একথা যেন করতালির কোলাহলে আমরা ভুলিয়া না যাই।

আমাদের দেশ গরীব—এ কথাটী কি শুধু ভাবুকতা ফলাইবার নৃত্যগীতি না একটী কঠোর এবং শুষ্ক সত্য। যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের বিবেচনা করা উচিত, আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ পত্র প্রচার করিতে হইলে উহার মূল্যের পরিমাণ কমাইতে হইবে। যে ভূমি উৎপীড়ন অত্যাচারে নগ্না, কঙ্কাল-কণ্ঠা, শীর্ণা শ্মশান-কালীতে পরিণত হইয়াছে, আজ তাহার জন্য তোমার পত্রিকার অফিসে ব্যাণ্ডবাদ্য বাজিলে অবস্থা বিশেষ অগ্রসর হইবে না—ওই শ্মশানের দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া তোমাকে চলিতে হইবে। নূতন টেক্সের আতিরিক্তও বর্জ্জন করিতে হইবে।

যথার্থতঃ এই অজ্ঞান শৌখিক-বৃত্তি দ্বারা কোন দিকে লাভ নাই। এক দিকে ইহা

অনন্ত মূর্দ্ধা মানবের মাথায় গিয়া পৌছেনা, অন্য দিকে সম্পাদকের গৃহকোণের লৌহ-বেষ্টনে লুক্কায়িত রজত কাঞ্চনের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয় না। সম্প্রতি সংবাদপত্রের সফলতা বিষয়ে যে উল্লম্ফনমুখী বীরজয়ন্তিকার কাহিনী শোনা যায়, তাহা সত্যের চন্দ্রাতপ হইতে কত দূরে, এই একটী কথা হইতেই উপলব্ধি হইবে।

ঠিক এই জন্যই দেশ দুর্ব্বল থাকা সত্ত্বেও অবস্থা পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য হইতেছে না। ভারতবাসীর মোটামুটি দৈনিক আয় এবং ইংলণ্ডীয়ের দৈনিক আয় এতদুভয় তুলনা করিয়া সংবাদপত্রের মূল্যরূপী নূতন টাকা ধার্য্য হওয়া প্রয়োজন।

কোন কোন চতুর বিজ্ঞাপনদাতা এক অভিনব উপায়ে বিক্রেয় দ্রব্যের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কথিত আছে, কোন ঔষধ-বিক্রেতা বিনা মূল্যে কিছুকাল ঔষধ বিতরণ করিতে থাকে। সেই ঔষধে লোক অভ্যস্ত হইয়া গেলেই একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বসে। প্রথম আবিষ্কারের পর ঘড়ি বিক্রয় সম্বন্ধেও এইরূপ কিম্বদন্তী শোনা যায়। সম্প্রতি এইরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য দেওয়া যায়।

অবশ্য বর্ত্তমান আক্ষরিক শিক্ষার অপেক্ষাকৃত অবিস্তৃত অবস্থায় কোন হতভাগ্য সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারীকে উপরোক্ত উপদেশ প্রদান করিবার প্রলোভন হইতেও আত্মসংবরণ করিতে হইতেছে। কারণ উপরোক্ত কার্য্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

কিন্তু এটা বোধ হয় বিনা প্রতিবাদে বলা যায় যে, ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয়ের এক কোণে সংবাদপত্রের জন্য আসন রচনা করিবার পূর্ব্বে কেবল পাটোয়ারী বুদ্ধি খরচ করিলে দেশের সর্ব্বাভিভাবী ভাব-তরঙ্গের সহিত যোগ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। বিস্ময়-স্বরূপ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, আমাদের দেশে সংবাদ পত্রের মূল্য বার্ষিক আট আনা কিম্বা বার আনার বেশী হইতেই পারে না। দৈনিকপত্রের কথা হইতেছে না, কারণ তাহা চাষামুটে প্রভৃতির কুটীরে কিছুকাল প্রবেশ করিতে পারিবে না। অথচ সম্প্রতি নগর ও পল্লীর যাবতীয় সংবাদ পত্রের মূল্য দেড় টাকা, দুই টাকার কম নহে।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কি করিয়া বাঙ্গালা দেশে এত স্বল্প মূল্যে কাগজ দেওয়া যাইতে পারিবে? যখন জগতে ইহা অপেক্ষা নানা দুরূহ প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গিয়াছে, তখন সংক্ষেপতঃ ইহার আংশিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

দেখা যাইতেছে, বায়ান্ন সপ্তাহে তের আনা পয়সা পোষ্টেল বায়ুরূপী তিমি মৎস্যের উদরে প্রেরণ করিয়া আট আনা পয়সা খরচ করিয়া কি করিয়া এই দুরূহ, দুস্তর সাগর পার হওয়া যায়। এই 'ভেলা'র সাহায্যে উত্তরণ চেষ্টা যে নিতান্ত মোহধ্বান্ত-জাত নির্ব্বুদ্ধিতা নহে, ইহা কিঞ্চিৎ দেখাইতে হইবে। আমি মনে করি, মফঃস্বলে পোষ্ট আফিস যন্ত্রটার যত কম ব্যবহার হয়, ততই ভাল। ইহাতে অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়, অথচ কার্য্যও পণ্ড হয় না। কিঞ্চিৎ ভূমিকা পূর্ব্বক একটী উদাহরণ দেওয়া যাক্।

আমাদের দেশের জনসাধারণ অনবরত খবরের কাগজ অধ্যয়ন করিয়া এমন সংবাদ-কাতর হইয়া উঠে নাই যে, ঠিক কেবল বিশেষ দিনে, বিশেষ সময়ে কাগজ হাতে না আসিলে একেবারে অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

বলা আবশ্যক, আমি শিক্ষিত সাধারণের কথা বলিতেছি না।

যেদিন উপযুক্ত অবস্থা হইবে, তখন আমরা বহু পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছি, মনে করিতে হইবে। ঐরূপ অবস্থায় সংবাদ পত্রের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলে জনসাধারণ স্ব-ইচ্ছায় অনায়াসে অন্যান্য ব্যয় হ্রাস পূর্ব্বক এতদর্থে কিছু অধিক ব্যয় করিতে ইতস্ততঃ করিবে না।

অর্থাৎ আপাততঃ দুই একদিন পরে কাগজ হাতে আসিলেও, কৃষক-বণিকদের তেমন কোন হানি নাই। কাজেই কোন গ্রামে পাঠাইতে হইলে সেই গ্রামগামী কোন লোকের দ্বারা দুই তিন শত কাগজ পাঠান পৃথিবীর পক্ষে তেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বুকপোষ্টে পাঠানও মন্দ নহে। যে জায়গায় এই তিন শত কাপি পাঠান হইবে, সেই জায়গা হইতে আবার তাহা দূরতর এবং অন্তরতর প্রদেশ সমূহে আরও পাঠান হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ তাহা পল্লীর বাঁশবনের ছায়ামলিন কুটীরে, বট গাছের ছায়ায় সমবেত পল্লী সাধারণের অন্তঃপুরে সহজে প্রবেশ লাভ করিবে।

বর্ত্তমান আন্দোলনের মাঝ হইতে কলিকাতার কোন কোন নূতন প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পোষ্টআফিস পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বল শহর সমূহে চারি শত কি পাঁচ শত কাপি রেলওয়ে পার্শেলে প্রেরণ করিয়া স্বল্প মূল্যে কাগজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া অত্যন্ত সফল হইয়াছে। ইহাদের আশ্চর্য্য কাটতি হইয়াছে। এই উপায়ে এবার ভ.ব. প্রচারের সহায়তা সম্ভব হইয়াছে।

ইহাতে মূল্যের স্বল্পতা আরও একদিকে সম্ভব হয়। একদিনে সমগ্র বৎসরের মূল্য দেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এক পয়সা দিয়া সংবাদ ক্রয় করিতে যাওয়া তেমন দুঃসাধ্য নহে। এ কথাটী সংসারী ধনী দরিদ্র সকলেই অল্পবিস্তর বোঝে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, দুএকটা বিলাতী ফ্যাসন ত্যাগ করিয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মূল্য হ্রাস করিলে তেমন কিছু অন্যায় করা হয় না। তুবরী হাতে লইয়া মধুর আওয়াজে পুলকিত, মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত করিয়া গর্ত্তের ভিতরে লুক্কায়িত সূর্য্যালোককাতর অনন্তদেবকে আহ্বান করিতে হয়। তারপরে একবার তোমার ঝুলির ভিতর ঢুকিলে এবং তোমার অন্ন আস্বাদন করিলে, তুমি যাহাই করনা কেন, সে তোমাকে আর ছাড়িবে না। সুলভতার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্রবিস্তৃতি সম্বন্ধে কোন ইংরেজ লেখকের মত উদ্ধৃত করিলে প্রতীয়মান হইবে।

"Nearly every town of 15,000 inhabitants has its own *daily paper.* Scarcely a county seat in the settled part of the United States is without its weekly paper even if the population should be below 1000 W. Ried.

নূতন আমদানী করা কোন কাজের গোড়াতেই আমাদের বিভীষিকা জন্মান ঠিক নহে। আমাদের দেশে আখেড়া এবং ধর্ম্মশালার জন্য জাতি অকুণ্ঠিতচিত্তে যতটা ব্যয় করে, হাস্পাতাল বা ক্লাব হাউস প্রভৃতির জন্য উহার ভগ্নাংশও করেনা। কারণ পূর্ব্বোক্ত আখেড়া ও ধর্ম্মশালা জাতির হৃদয় রাজ্যে স্থান পাইয়াছে, শত বৎসর পর্য্যন্ত উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইয়াছে, কাজেই মন্যাশিয়াবিচ্ছুরিত ভূখণ্ডের ন্যায়

জাতির হৃদয়ে উহার শোণিত-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আজ ঐ সেকেলে আখেড়া ও ধর্ম্মশালার জন্য বহু হর্ম্ম্যপতিকে সর্ব্বস্ব দান করিতে দেখা যায়।

বর্ত্তমান যুগের ভারতবাসীর মাঝে কেবল একদিকে দান করাইবার প্রবৃত্তি জন্মাইলে চলিবে না। এক হাতে কেবল একদিকের কাজ কর্ম্ম অভাব অভিযোগ প্রভৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে চলিবে না। সব্যসাচীর ন্যায় উভয়হস্তে উভয় দিকের বিরাট কর্ম্ম-আবর্ত্তের গতি নিয়ন্ত্রিত ও সফল করিয়া তুলিতে এজন্য পূর্ব্বকথিত সমাজদুর্গে নবাগত অতিথির স্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরোক্তভাবে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গ্রামগণ্ডীর ক্ষুদ্রতার কর্দ্দমে নিমজ্জিত সাধারণের মাঝে সংবাদপত্রবিস্তৃতির ব্যবস্থা করিলে সহজেই স্থানে স্থানে কয়েকটী কেন্দ্র গঠিত হইয়া উঠা সম্ভব। এইরূপ স্থান বিশেষ হইতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নিত্যগমনশীল লোকের হস্তে দুই তিন শত পত্র অর্পণ করা যাইতে পারে। এই কেন্দ্রগুলি শুধু সংবাদপত্র প্রেরণের কারখানা মাত্র হইবেনা, ইহা হইতে সংবাদ পত্রের জন্য সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থাও হইবে।

যাহারা গ্রামে থাকে, তাহারা ভাবেনা যে, জগতের উড্ডীন কল্লোলের মাঝে তাহাদেরও যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যে সব সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অনুষ্ঠান জগতের প্রাণে প্রাণে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার জীবন-ধারার সহিত যে তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে, কিম্বা থাকিতে পারে, একথা তাহাদের কিছুতেই কল্পনা করিবার অবসর থাকেনা; কাজেই তাহারা স্বীয় ক্ষুদ্র গ্রামগণ্ডীর মাঝে আপনার অঙ্কুরস্থ মানব-শক্তি প্রোথিত করিয়া ফেলে।

আমাদিগকে তাহাদের এই সঙ্কীর্ণ চিত্তের মাঝে প্রসারতা আনিতে হইবে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপালোকোদ্ভাসিত পর্ণকুটীরের মাঝে জগতের সনাতন, চির-জাগ্রত সৌর-কিরণের প্রতিচ্ছায়া দেখাইতে হইবে। তখনি তাহারা বিস্মিত হইয়া নিজের গৃহদ্বার খুলিবে এবং চকিতবিস্ময়াহ্লাদে ক্ষুদ্র কুটীর-সোপান হইতে জগতের অম্লান-বিগলিত জীবনরাজ্যে আপনার আসন দেখিয়া সুদূর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে।

কাজেই সংবাদপত্রের সংখ্যাগুলি উপকূলের স্থান বিশেষ হইতে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ড সমূহের ন্যায় হ্রদবক্ষে অজ্ঞাত, অসংলগ্ন, বন্ধনবিহীন, চঞ্চল, ক্ষুদ্র, চক্রাবর্ত্ত চূর্ণ মাত্র সৃজন না করিয়া সমাজ বক্ষে শৈবাল-জালের ন্যায় একটা দৃঢ়, ঘনিষ্ট যোগবন্ধন ঘনাইয়া তুলিবে।

স্বল্পমূল্যে কাগজ দেওয়ার অন্য ব্যবস্থাও যে বাঙ্গালা দেশে হয় নাই, এমন নহে। তন্মধ্যে প্রতি বৎসর নানা মূল্যবান গ্রন্থ উপহার প্রদান করিবার ব্যবস্থা অন্যতম। অবশ্য কেবল কলিকাতার সাপ্তাহিক গুলি একটা উপহার দিতে সক্ষম হইয়াছে।

পত্রিকার মূল্য এই উপায়ে এক হিসাবে কম করা হইয়াছে, কারণ সাধারণের নজর পত্রিকার মূল্যবান্ পুরস্কারগুলির উপর যতটা লোলুপ থাকে, পত্রিকার জন্য ততটা নহে; সেটাকে একটা অতিরিক্ত লাভ মনে করা হয়। পত্রিকার প্রতি এইরূপ তাহাদের অনেকের বিরক্তি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য পুরস্কার দেওয়ার প্রথাটী কাহারও নিকট নিন্দনীয় হইয়াছিল, শোনা যায়।

আমার মনে হয়, এই পুরস্কারের প্রথার

বাঙ্গালা দেশের ইংরাজী শিক্ষিতগণের এবং কিঞ্চিৎ অর্থবানগণের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবসম্পদের অধিকারী হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রোথিতনামা লেখকগণের গ্রন্থাবলী স্বল্প মূল্যে আয়ত্তাধীন হওয়ায় বাঙ্গালার সাধারণ ভাব ও জ্ঞানসম্পদ্ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া নানা শাস্ত্রগ্রন্থ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত গুলি দেশময় বিস্তার কার্য্যটী, চীনের খবর বা তিব্বতের বল্পনা দেশকে বিতরণ করা অপেক্ষা কম কার্য্য নহে। সমগ্র বাঙ্গালা দেশ অন্য কোন কারণে হউক না হউক, এই বিরাট কার্য্যের জন্য বাংলার সংবাদ-পত্রকারগণের নিকট ঋণী। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মনীষী গ্রন্থকার-গণের গ্রন্থাবলি কিরূপ স্বল্পমূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সকলেই জানেন।

কিন্তু ইহাতে আমার বক্তব্য কথা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। পুরস্কার খরিদ করিয়া খবরের কাগজ পড়িবার ক্ষমতা বাঙ্গালার জনসাধারণের নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জন্য মূল্য সংক্ষেপ নিতান্ত প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে এক একখানি, কিম্বা একখানের চারিখানি, কাগজের মূল্য স্বতন্ত্রতঃ লওয়া দরকার, কারণ একসঙ্গে আট আনা পয়সা দেওয়া ও মুদী মুটে বা কৃষক-বেণের পক্ষে সহজ হইবে না।

পূর্ব্ব-কথিত উপায়ে স্থানে স্থানে কতক গুলি কেন্দ্র গঠিত হইয়া উঠিবে। সম্প্রতি বিদ্যালয় এবং শিক্ষামন্দিরগুলির উপর রাজ-পুরুষের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই নব-বন্ধনে আনিয়া ফেলা প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃত হইবে না, ততদিন সন্ধ্যায় একত্রিত করিয়া, ভৃত্য, জেলে, কৃষক, তাঁতি, জোলাদের মাঝে পাঠ করিয়া মৌখিক উপায়ে ভাব বিস্তারের একান্ত প্রয়োজন।

বলিতে গেলে যথার্থতঃ আমাদের নিম্ন শ্রেণীর মাঝেই সাহস ও সংকল্প সারল্যের একমুখী তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং বিশ্বাসের অক্ষয় অমৃত-উৎস রহিয়াছে। এই নিম্নশ্রেণীকে একান্তই আমাদের হাতে আনিতে হইবে। হাতে যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু যথার্থ হাতে টানিয়া আনার অর্থই হচ্ছে কার্য্যের ভিতর দিয়া সম্পদ ও বিপদের, অত্যাচার ও উৎ-পীড়নের কালে খাঁটি বন্ধন ঘনাইয়া তোলা।

নিম্নশ্রেণীরা বরাবর আমাদেরই দিকে চাহিয়া আছে, এ কথাটীর ভেরী-নিনাদ করিলে কার্য্য বেশীদূর অগ্রসর হইবেনা—ইংরেজ গবর্ণমেন্টও ঐ এক কথাই দিবারাত্র বলিয়া বেড়াইতেছে।

বিবাদে যদি তুমি একান্ত আশ্রয় হও, পুলিশ চৌকীদারের উৎপীড়নে, অর্থকৃচ্ছ্রতার মাঝে, গৃহদাহে, জলপ্লাবনে, পুত্রশোকে, দুর্ভিক্ষের কোপে, রোগের জ্বালায় যদি তোমার অভয়বাণী, মুক্তহস্ত ও আলিঙ্গন অনুভব করিতে পারে, তবে হিন্দুই হোক্, মুসলমানই হোক্, কেহই ইংরাজের কথায় মাথা ফিরাইয়া বসিবেনা। তোমার অঙ্গুলি হেলনে সকলেই চালিত হইবে, তোমার তর্জ্জনী দেখিয়া সকলেই সঙ্কুচিত হইবে। নচেৎ বাক্যজালে চক্ষুর দৃষ্টি মাত্র ফিরাইতে পার—হৃদয়ের দৃষ্টি নহে। এই জন্য সাময়িক কোলাহলে স্থায়ী অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার বালকত্ব ত্যাগ করিয়া পল্লীর মাঝে প্রশস্ত-শীতল, উদার-মধুর, স্বচ্ছশুভ্র দীর্ঘিকার ন্যায় তোমার উন্মুক্ত আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া

বর্ত্তমানের পল্লীজীবনের স্নেহ ও প্রীতির দুর্ভিক্ষ অন্তর্হিত কর।

দেশের এই মলিন জনসাধারণ তোমাদের দিকে তৃষিত নেত্রে চাহিয়া আছে। আশ্রয় এবং আশ্রিতের ভাব চিরকালই সমাজে বর্ত্তমান থাকে, স্বাভাবিক নিয়মে চিরকালই ইহা ঘটিয়া আসিতেছে। সকলের মাঝে এইরূপ একটী প্রবৃত্তি শৈশব হইতে মুকুলিত হইয়া উঠে, সামাজিক জীব বলিয়া মানুষ এই অপরাধ বা গৌরব স্বীকার করিয়া লইতে পারে। তজ্জন্য ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন।

পিতাপুত্র, সুহৃদ্‌বন্ধু, শুভার্থী, শুভকামী অল্পবিস্তর সকলেই এই সামাজিক স্নেহের ফাঁদে পড়িয়াছে। আমাদের পল্লীসাধারণও এইরূপে মণ্ডল, পঞ্চায়েত, জমিদার, উত্তমর্ণ প্রভৃতির আকর্ষণে চিরকালই জ্যোতিষের ন্যায় মণ্ডলনৃত্য করিয়া আসিয়াছে। আজ হঠাৎ ইংরাজরাজের আগমনে সকলের দৃষ্টি পরস্পর হইতে সংহৃত হইয়া ইংরাজের পুলিশ-সান্ত্রী, বন্দুক-সিপাহী, ব্যবহার-বিধি, পোষাক-পরিচ্ছদ, গাড়ীঘোড়ার দিকে ফিরিয়া গিয়াছে, কাছে থাকিয়াও পরস্পরকে কেহ চিনেনা, একের উপর অত্যাচারে অন্যে নিজের উপর কষাঘাত অনুভব করে না। মাঝে মাঝে মাত্র ইংরাজ হইতে বিধাতার দিকে চাহিয়া সাধারণ হাহাকার করিয়া উঠে।

সময় হইয়াছে, যখন এই অনাদরে উপেক্ষায় লুপ্তশ্রী জনসাধারণের ভিতর প্রাচীন সম্বন্ধ প্রস্ফুটিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। এই জন্য সংবাদপত্রগুলি এক ঝাঁক মাছির ন্যায় কলিকাতা হইতে উড়িয়া আসিয়া পড়িলে চলিবে না—ঐ পানা-পুকুরের শ্যামল আবরণ, পদাঙ্কগঠিত বঙ্কিম পথের উপর স্বভাবজাত ঘইঞ্চা ও শণের কার্পেট, ভাঙ্গা বেড়ার উপর দোদুল্যমান উচ্ছে লতিকার নৃত্য, তিসি সরিষার ক্ষেত, বাঁশবনের সমীপস্থ ময়ূরকণ্ঠী অনাবদ্ধবৃক্ষের গুচ্ছশ্রেণী, পুকুর পাড়ের কাঁঠাল বন হইতে উচ্ছ্রিতদেহ ফলভারনত ডুমুর-বৃক্ষ, সূক্ষ্ম-কুঞ্চিত-পল্লব তিন্তিড়ী বৃক্ষের শাখাবাজি, শাখাপ্রশাখায় নৃত্য-বিহ্বল বালকের কোলাহল প্রভৃতি হইতে আবেগ ও ভাব সংগ্রহ ও পুষ্ট করিতে হইবে—ববার টায়ারের নিঃশব্দ তস্কর-গতি, ফুটপাতের ধাক্কাধাক্কি ও রেলওয়ের নাসিকা-গর্জ্জন হইতে নহে।

সংবাদপত্র আলোচনার এই সন্ধিস্থলে আমরা একটী নিতান্ত গুরুতর প্রশ্নে উপস্থিত হই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সংবাদপত্র চর্চ্চায় সর্ব্বপ্রথমই এই প্রশ্ন উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। "নগর ও পল্লী বিপর্য্যয়" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়াছি। তবুও তৎসম্বন্ধে দুচারটী কথা উত্থাপিত করিলে বিশেষ অন্যায় করা হয় বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরাজ রাজত্ববিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সমগ্র সহরগুলি ধীরে ধীরে তৈলবিহীন প্রদীপের ন্যায় নিষ্প্রভ ও হৃতজ্যোতিঃ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধীরে ধীরে অতীত ইতিহাসের চিহ্নকণা পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের লাঠি ও সড়কির জোর, বাঙ্গলার জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতা, দেশব্যাপী, সজীব, সুস্থ সমাজ-বন্ধন, জমিদারদের মধ্যে সংগ্রাম, বিরাট-বিদ্রোহের আয়োজন, রক্তের উন্মত্ত; উদ্দাম, দিশাহারা নৃত্য, আর্জ্জ মসৃণ চাপকানের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত, পদে পদে লাঞ্ছিত, বিকৃত

বাঙ্গালী-হৃদয়ে জাগে না। নবাবী আমলের উন্নত ললাট, গর্ব্ব-পুলকিত দেহ, দশদিকের দিক্‌পালের ন্যায় অবস্থিত দশটী ফৌজদারীর বিরাট ভাবসম্পদ কোথায় গেল? কোথায় আজ রাজমহল, বর্দ্ধমান, পূর্ণিয়া, চট্টগ্রাম, আকবরনগর, হুগলী প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য ও সম্মান? ফৌজদারগণের সাজসজ্জা, হাজারী দোহাজারী মনসবদারগণের মস্তকোপরি প্রসারিত কিংখাপের ছত্র, 'আসাশোটার' আড়ম্বর, বাঙ্গালা সৈনিকের সদর্প পদনিক্ষেপ নর্ত্তকীদের মাঝে ধনীরসিকদের সম্মিলন, স্বাধীন-শক্তির উন্মাদনায় রোমাঞ্চিত-দেহ যুবকগণের স্মৃতি আজ কোথায়? রেলওয়ে-ষ্টীমারের এঞ্জিন-মিলের ধূম্ররাশি আজ সব কিছুর উপর পর্দ্দা ফেলিয়াছে।

লোক সব ভুলিয়াছে। ভাবিতেছে, শুধু লাট সাহেবের লেভি, লাট সাহেবের দেশের ঐশ্বর্য্য। ভাবিতেছে, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের ভূগোল, ইংরাজের বিদ্যা, ইংরাজের ভাষা, ইংরাজের মধুর স্মিত হাস্য। ইংলণ্ডটী এখনও অধিকাংশ যুবকের কাছে যেন স্বর্গের কাছাকাছি কোন ব্রহ্মলোক। ইংলণ্ড হইতে কেহ আসিলে যতটা বিস্ময় উদ্রেক করিবে, স্বয়ং সহস্রচক্ষু হাজির হইলেও ততটা হইবে কিনা, জানি না। অবশ্য সম্প্রতি এই ভাবের কিঞ্চিৎ ভাটা পড়িয়াছে।

নবাবী আমলে উপরোক্ত উপনগর গুলি ইউরোপীয় ইতিহাসের "borough" নামক নগরশ্রেণীর ন্যায় ছিল। উহাদের ইতিহাসের স্বাতন্ত্র্য ছিল। মোটামুটী তখন দেশের প্রাণ ও শক্তি দেশকলেবরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থাকিয়া উহার স্বাস্থ্যবিধান করিত—একস্থান হইতে উহারা নির্গম করিয়া দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিত না।

ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত উপনগরের শ্মশানের উপর ভারতের অর্থ-লুণ্ঠনের প্রধান দ্বার-স্বরূপ কলিকাতা নগর-রূপী বিলাতী কল বসিয়াছে। এই ইংরাজ-শিকারীর অদৃশ্যজালের আকর্ষণে এবং নিক্ষিপ্ত তণ্ডুলকণার লোভে তথাকথিত অনেক বিশ্ব-ঝঙ্কারী লোক জুটিয়াছে। গ্রাম, পল্লী, সমাজ ছাড়িয়া, সদলে হৈ হৈ রবে কলিকাতার দিকে ছুটিয়াছে—কলিকাতা এই কলিযুগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব কিছু দিতে পারে, এই বিশ্বাস এখনও প্রবল রহিয়াছে। এই নগর-চুম্বকে অনেক ঐশ্বর্য্য চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

জাতি-কলেবরে যদি নানা স্থান সম্মানের সহিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পরে মনুষ্যত্বগর্ব্বে সকলেই পুলকিত এবং আত্মসম্মান-জ্ঞানের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-প্রসার ও আত্ম-বিস্মৃতির সূচনা হইবে—নচেৎ নগর ছাড়া পল্লীমাত্রই যদি বিকৃত হয়, নগরের টিক্‌টিকিও যদি পল্লীর রত্নাকর পদবীকে জয়ঢাক বাজাইয়া নগণ্য করিয়া তোলে, তবে উভয়তঃ জাতীয় স্বাস্থ্যনাশের সূত্রপাত হয়।

কলিকাতা যেরূপ মফঃস্বলের উপর ছায়া-পাত করিয়া আছে, এমন কোন একটি ক্ষুদ্র নগর এরূপ বিরাট-দোদর উপর শুধু কথার জোরে এবং কতকটা পল্লী ও মফঃস্বলের নিরীহতায় ছায়াপাত করিতে দেখা যায় না। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারে পল্লীর লোকের কোন বিষয়ে নেতৃত্ব করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের বড় বড় কথাও মফঃস্বল শুনিতে বাধ্য হইতেছে।

এই সব সম্ভব হইয়াছে, কলিকাতার সংবাদ পত্রের প্রভাবে। দেশের যাবতীয়

দৈনিক এবং প্রতিপত্তিশালী সাপ্তাহিকগুলি কলিকাতা হইতে অর্থাৎ লক্ষ বর্গ মাইল প্রদেশের তথ্য ছয় বর্গ মাইল-ব্যাপী ক্ষুদ্র স্থান-বিন্দু হইতে নির্গত হইতেছে।

মফঃস্বলের কাগজ মফঃস্বলের লোকের'ই পড়ে না, এক ডিষ্ট্রীক্টের কাগজ অন্য ডিষ্ট্রীক্টে কখনও পড়া হয় না। মফঃস্বলের কাগজের আয়তন অনুসারে দাম অত্যন্ত বেশী, তার উপর কোন মূল্যবান্ গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয় না—এইজন্য ইহার গ্রাহক সংখ্যা যৎ-সামান্য। যে কারণে উপনগর দিন দিন হতশ্রী ও প্রতিপত্তি-শূন্য হইয়া উঠিতেছিল, সে কারণে মফঃস্বলের সংবাদপত্র গুলিও মাথা তুলিতে পারে নাই।

পুরস্কার প্রভৃতি দ্বারা গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থিক লাভ প্রভৃতি হওয়ার কলিকাতার কাগজগুলির আকৃতি ও ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার কাগজ-গুলি কেবল কলিকাতার নহে, সমগ্র বিরাট বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইতে স্পর্দ্ধা করি তেছে।

ইহাতেই মুস্কিল। কারণ মফঃস্বল সম্বন্ধে কলিকাতার সম্পাদকগণের অভিজ্ঞতা নাই বলিলেও চলে—ইঁহারা মফঃস্বলের সহর-গুলিও জীবনে কখনও দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমি এমন একটী সম্পাদক'কও জানিনা, যিনি বাঙ্গালার সহরগুলি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অথচ বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে কলরব করিতে কেহই পশ্চাদ্‌পদ নহেন।

এই জন্যই বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে নগরের ন্যায় ক্ষমতাশালী সুবৃহৎ কাগজ বাহির না হইয়া কেবল একটী জায়গা হইতে ভাল মন্দ সব কিছু বাহির হইতেছে।

বলা আবশ্যক, এক জায়গায় নির্ব্বিঘ্নে উপবেশন করিয়া কলের জল পান করিয়া ও গ্যাসালোকে চস্‌মা খুলিয়া সম্পাদকতা করা যে কোন জাতির শৈশবে মাত্র সম্ভব হয়। কাজেই ইহার প্রতিকার সহজেই জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভব হইবে।

ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি জেলার জন সংখ্যা কুড়ি হইতে ত্রিশ লক্ষ পর্য্যন্ত। এজন্য আমার মনে হয়, প্রত্যেক প্রধান ডিষ্ট্রীক্ট হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ সহস্র গ্রাহক কর্ত্তৃক অনুগৃহীত এক এক খানা পত্র বাহির হওয়া উচিত। এতদভাবে দৈনিক অন্ততঃ একখানি ডিভিশন (Division paper) কাগজ বাহির হইলেও মন্দ হয় না।

কলিকাতার দৈনিক কাগজগুলির ন্যায় অর্থাৎ "অমৃতবাজার", "বেঙ্গলি", "বন্দেমারতম্' প্রভৃতি ন্যায় পত্র যদি এক একখানি পত্র বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী প্রভৃতি বিভাগ হইতে বাহির হয়, তবে মুহূর্ত্তের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ কিরূপ আলোকিত ও অধৃষ্য হইয়া উঠে, কল্পনা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মফঃস্বলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্যক্‌রূপে জাগ্রত না হইলে ইহা সম্ভব হইবে কিনা জানিনা। কবে এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগিবে? কবে নগর হইতে দেশের চক্ষু পল্লীর দিকে ফিরিবে? সংবাদপত্রগুলি ব্যবসা প্রভৃতির দ্বারা অস্বাভাবিক উপায়ে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, পল্লীজগৎ আলোকিত হইতে পারিতেছে না এবং জাতীয় ভাব-সম্পদেরও যথার্থ স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কাজেই এই অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য দূর করা একান্ত প্রয়োজন। মফঃস্বলের মধ্যে আত্মসম্মান জাগ্রত হইলে এবং কলিকাতা-নিরপেক্ষ

হইয়া নিজেদের মধ্যে ঘনবন্ধনের সূচনা করিতে পারিলে কার্য্যটী বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।

বাঙ্গালার সংবাদপত্র চর্চ্চায় ব্যক্তিগত কাগজের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে চলে না। কেহ না কেহ এক একটী কাগজকে নিজের সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছেন—নিজের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে কাগজে লিখা চলে, পল্লির বা সাধারণের সহিত নিতান্ত স্বার্থের প্রয়োজন ছাড়া আর কোন সম্পর্কবন্ধন নাই। এই জন্য বিলাতী কাগজগুলির ন্যায় মতামতের অদ্বৈত স্রোতঃ নাই—রবারের ন্যায় ইহাদের মতামত একান্ত স্থিতিস্থাপক। এইরূপ সংবাদ পত্রের সাহায্যে, আত্মবাহাদুরীর বৃষ্টিজাল নিক্ষেপ করিয়া মেঘরাজ্য হইতে নিজকে স্বনির্ব্বাচিত নেতা ঘোষণা করার অভিপ্রায় দেশবাসীর অজ্ঞাত নহে।

বাঙ্গালার ভাবসম্পদ নিতান্ত কম নহে—ভাবুকের সংখ্যাও নিতান্ত কম বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ সকলের হাতে খবরের কাগজ থাকে না এবং থাকা সম্ভবও নহে—এই সহজ কথাটী আশা করা যায়, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ভুলিবেন না। ইহা যদি না ভোলেন, তবে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার পঙ্কিল সলিলকণা নিক্ষেপ না করিয়া, হৃদয়বান লোকের ভাব-পরাগ চূর্ণে দেশকে অভিষিক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। নিজের মস্তকের উপর পুষ্পবর্ষণ ও পুরন্ধ্রীর লাজবর্ষণ কল্পনা করিয়া উন্মত্ত না হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তির জন্য সেই স্থান মুক্ত রাখিবেন।

ইহা উপলব্ধি হইলে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার প্রাকার-বেষ্টনের মাঝেও বাহিরের হাওয়া প্রবেশ করিতে পারিবে।

সৌভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে যৌথ-যত্নে কয়েকখানি পত্র বাহির হইতেছে। যৌথ কোম্পানীরই সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হওয়ায় অনেক প্রলোভন অতিক্রম করা হইয়াছে।

এ কথা যেন আমরা কিছুতেই ভুলিয়া না যাই যে, বর্ত্তমানের সুপ্রতিষ্ঠিত, সুশৃঙ্খলিত স্বাধীন ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সংবাদপত্রগুলি কেবল প্রশংসার প্রগল্‌ভতায় হালফ্যাশনের কার্পেট-বিহারী যে সমস্ত ড্রয়িং রুম-নেতা তৈয়ার করিতেছে, উহার অনুকরণে, পরাধীন, হৃতসর্ব্বস্ব ভারতে সেইরূপ সংবাদ পত্রের তৈয়ারী বিলাসী নেতা রচনা করা সম্ভব নহে। স্বাধীন ইংলণ্ডে গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, ম্যাট-সিনীর জন্মগ্রহণের দিন চলিয়া গিয়াছে—ভারতে এখনও যায় নাই। সংবাদপত্র চেম্বারলেন বা বেলফোর, রোজবেরীকে নেতা সৃজন করিতে পারে, ওয়াশিংটনকে পারে না। ইহারা কার্য্যের ভিতর দিয়া জন্মগ্রহণ করে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে আত্মসংবরণ করিতে হইতেছে। সংবাদপত্র দেশের মধ্যে বিরাট ক্ষমতার আধার, ইহার স্বাস্থ্য সর্ব্বান্তঃকরণে অনুধাবনার বিষয়। বিশেষতঃ ভারতে ইহার একটী বিরাট ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু সেই জন্য বিলাতী ফ্যাসানে চলিলে হইবে না। ইউরোপ ও ভারতের অবস্থা আকাশ পাতাল তফাৎ।

মফঃস্বল সংবাদ পত্রের মধ্যে গ্রাম্য নীতির আলোচনা যত অধিক হয়, ততই ভাল। শুধু, তীর্ক্ক-নীতি, জাপান-নীতি ও সীমান্ত-নীতি আলোচনা প্রচুর নহে। বরং ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম। যথা-সম্ভব গ্রাম্য কথা, গ্রামের দুঃখ দৈন্য, গ্রামের

ইতিহাস সাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব অতীত-বর্ত্তমান আলোচনা হওয়া দরকার। গ্রামের উপর, দেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি প্রসারিত করা প্রয়োজন।

পল্লীবাসীদের নিভৃত কোণে থাকিবার অর্থাৎ অতটুকু ক্ষুদ্র বিশ্বের মাঝে থাকিবার কোন অধিকার নাই। একান্তই তাহারা যতটুকু অজ্ঞান-সন্তোষে আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আমরা দ্বিধা করিব না। তাহাদিগকে ঐ নিভৃত মৌন কানন হইতে জীবনের পরিধি দূর-দূরতম দেশে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

যে সমাজে গ্রাম সজীব নহে, সে সমাজ শক্তিহীন। যে সমাজে উচ্চনীচের মধ্যে ঊর্ম্মি-মুখরিত শৈলনদী প্রবাহিত, সে সমাজে ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের রুধির-ধারা নিজে পান করিতেছে। আমাদের সমাজ বড়ই দুর্ব্বল, কারণ শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝে ঘনবন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে। পল্লিবাসী ও নগরবাসীর মাঝখানে প্রশান্ত সাগর। আমাদের কাজ অত্যন্ত সহজ নহে, এই সাগরের উপর সেতু-রচনা করিতে হইবে। মানবের মন জড়জগতের ন্যায় হৃদয়হীন, বিচারহীন নহে—এজন্য সফলতা কল্পনা করিতে আমরা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিনা।

পল্লীর অনাদৃত মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি স্কুল যখন সকলে দলে দলে যাইয়া উপস্থিত হইবে এবং বিচিত্রতাবিহীন গ্রাম্য স্কুলমাষ্টারের জীবনকে অভিনন্দন করিয়া, 'ভাই' বলিয়া আহ্বান করিবে এবং সমান ধর্ম্মী কর্ম্মী বলিয়া সম্মাননা করিবে, তখন কি তাহার একঘেয়ে দৈন্য হইতে সে একটু সুখ না হউক, শান্তিও পাইবে না এবং নিজের দশটী রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রীত জীবনকে ধিক্কারের পরিবর্ত্তে সামান্যরূপেও অনুমোদন করিবে না?

কাজেই গ্রামের সর্ব্বত্র সম্প্রতি আলোক নিক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন, বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালা দেশ অজ্ঞাত থাকা বড়ই লজ্জার কথা। বাঙ্গালী যুবকমাত্রেরই শিক্ষাবসানে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। দেশকে না চিনিয়া উন্নত করিতে যাওয়াটা কতকটা হাস্যজনক।

পরিশেষে সম্পাদক সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা বলিতে পারি কি? উপদেশ দেওয়ার দুরভিসন্ধি বর্ত্তমান লেখক কখনও করে নাই এবং কখনও করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তবে অবস্থা পর্য্যালোচনা করার অধিকার অল্প বিস্তর সকলেরই আছে। সম্পাদকগণের নিকট জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাঙ্গালা দেশটা নিজের চোখে দেখিবেন কি? জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য নহে, করতালির পটহ-নাদে স্ফীত হইবার জন্য নহে, অশ্ববিহীন মনুষ্যবাহিত শকটে আরোহণ করিতে নহে, সারি সারি পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান স্কুল ছাত্রের সেলাম পাইবার লোভে নহে—একান্ত কর্ত্তব্যবোধে, অপরিহার্য্য সম্পাদকীয় শিক্ষার অঙ্গ-রূপে, তাঁহারা বৎসরের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ, মফঃস্বল ও পল্লীতে কাটাইবেন কি? ইহাতে অপমানের কোন কারণ ত দেখিনা। ইহাতে সম্পাদকীয় কিরীট খসিয়া পড়ার ত কোন আশঙ্কা দেখিনা।

যাঁহারা সম্পাদক হইতে চাহেন, যে যুবকগণ ঐ পদবীর জন্য লালায়িত, তাঁহাদিগকে কি স্মরণ করাইতে পারি যে, রাজনীতি বলিয়া একটা শাস্ত্র আছে? এই শাস্ত্র যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সের অন্তর্ভুক্ত নহে,

এবং ইহাও যে একান্ত অধ্যয়নযোগ্য পদার্থ, একথা যেন তাঁহারা না ভোলেন। এইজন্য অন্ততঃ পাঁচটী বৎসর, তদভাবে উহার আংশিক কিছুটা কাল, অধ্যয়ন করা একান্ত দরকার, এ কথা স্মরণ করাইয়া দিলে আশা করি, তাঁহারা ক্রোধান্বিত হইবেন না।

সংবাদপত্র জগতের সর্ব্বত্রই অতিরঞ্জন-প্রিয়, এইরূপ একটা কিম্বদন্তী আছে। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন, গুরুতর প্রশ্নসমূহে সত্যের উপর আস্থা না থাকিলে সংবাদপত্র গুলি, জাতীয় কলঙ্করূপে দাঁড়ায়। অবশ্য সব সময় সকল কথা একেবারে নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয় না। কিন্তু সত্যের প্রতি যদি একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা থাকে, এবং সত্য পথে অগ্রসর হইবার যদি একটা তীক্ষ্ণ প্রবৃত্তি থাকে, তবে সত্য পথ হইতে বহুদূরে যাওয়া সম্ভব নহে। কিছুকাল হইতে এই সত্যপ্রাপ্তির অভাবে এই বাঙ্গালা দেশের সংবাদ পত্রগুলি জাতির পক্ষে লজ্জা-জনক হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেসের বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির রিপোর্ট দৈনিক পত্রিকাসমূহে কত বিভিন্ন ভাবে বাহির হইয়াছে, আলোচনা করিলে দেখা যাইবে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই ব্যাপারেও ইউরোপীয় আদর্শের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, সনাতন বিশ্বের সভ্যতাজননী এসিয়ার সভ্যতার নহে।

বাঙ্গালার সংবাদপত্রের একটা গৌরবের কথাও বলা প্রয়োজন। ইহার সাহস পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে, রাজদ্বারে অভিযোগ-ভীতি বহুপরিমাণে দূরে গিয়াছে। চিরকাল সংবাদপত্রের এই সাহস থাকা প্রয়োজন, ইহাই দেশের আশার কথা।

পরিশেষে একটা প্রস্তাব করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের বার্ষিক কি ত্রৈবার্ষিক কোন সম্মিলন বা কনফারেন্স্ সম্ভব কি? ইহাতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা আছে। এক-মতাবলম্বী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে কোন বন্ধন সম্ভব কি? একটী যৌথ কোম্পানী হইতে বাঙ্গালার প্রধান উপনগরগুলি ও কলিকাতা হইতে আট দশ খানি অভিন্নমতাবলম্বী কাগজ বাহির করা অসম্ভব কি? এই কেন্‌ষ্টিটিউসনের মাঝে সম্পাদকগণ মাঝে মাঝে স্থানান্তরিত হইতে পারেন। এক স্থানে বহু বৎসর একজন থাকিলে নানা দুর্ব্বলতা ও দলাদলির জালে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা, এই জন্য হুগলীর সম্পাদক মেদিনীপুরে, কি মেদিনীপুরের সম্পাদক চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইলে কার্য্যক্রম সুস্থ হয়। ইহাদের গঠিত কোন কেন্দ্র-সমিতির হাতে এইরূপ পরিবর্ত্তন করা প্রভৃতির ভার দেওয়া যাইতে পারে।

Cut and dried scheme দেওয়া নিস্ফল। কার্য্যের ভিতর দিয়াই নানা সুবিধা অসুবিধা, কণ্টক-বিঘ্নের ভিতর দিয়া আপনা আপনি স্বাভাবিক ভাবে কার্য্যক্রম বিকশিত হইয়া উঠে, নচেৎ মাপকাটি দ্বারা নির্ম্মিত নিখুঁত প্ল্যানও হাস্যজনক। প্রাণী-শরীরের ন্যায় যে কোন স্থায়ী কার্য্যের উৎপত্তি, গতি ও বিস্তৃতি স্বাভাবিক ভাবে মুখরিত হইয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশে অনেক স্কিম্ বাহির হইয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে তৈয়ারী করা ফুল ও ফল কোন পল্লীবৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া দিলেই অম্‌নি উহা প্রস্ফুটিত ও পক্ক হইয়া উঠিবে না—স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক স্থানের মৃত্তিকা হইতে রসগ্রহণ না করিলে চলিবে না—এ সহজ কথা যেন আমরা না ভুলি।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী।

কিছুকাল হইতে ভারতীয় রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে দুইটী বিভিন্ন দলের অবতারণা হইয়াছে। একটীর অনুচরবর্গকে moderates বা মধ্যমপন্থানুবর্ত্তী ও অপর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তকে সাধারণতঃ extremists বা চরমনীতি-বাদী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই দুই রাজনৈতিক দলের গুণাগুণ বা বিভিন্নতা যাহাই হউক, উভয়েই জাতির হৃদ্‌গত গভীর আলোড়ন ও অনুপ্রাণনের অভিব্যক্তি, উভয়ই দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল; উভয়ই জাতীয় ক্রমবিকাশের দুইটী ভিন্ন প্রতিচ্ছবি। এইরূপ বিভিন্ন ও বিসংবাদী শ্রেণী-বিভাগ সকল যুগের সকল অবস্থাতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রভিন্নতাযুক্ত দল বা আয়োজন, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্বরূপ ও বিভিন্ন মুখীন আভ্যন্তরীন বিকাশসূচক পরিবর্ত্তনের বাহিক নিদর্শন মাত্র। সুতরাং আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে এইরূপ দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির অনুষ্ঠান দেখিয়া যাঁহারা রোষ, ক্ষোভ ও বিস্ময় পরবশ হইয়া, এইরূপ অনুষ্ঠানকে নিন্দা ও সেই কারণে আমাদের জাতীয়-জীবন-লক্ষণগুলিকে মুমূর্ষুদশাগ্রস্ত রোগীর ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিব যে, হয় তাঁহাদের অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বা অর্ব্বাচীনতা-জ্ঞাপক, না হয় তাঁহাদের উক্তি বিশুদ্ধবিদ্বেষ-দুষ্ট, সুতরাং ঘৃণায় পরিবর্জ্জনীয়। চিন্তা ও মতের বিভিন্নতা ও বিরোধ চিরকালই মানব জীবনের একটী স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বিশেষত্ব। এই জন্য শুধু রাজনৈতিক বিষয়ে কেন, সাহিত্য রাজ্যে, দর্শনশাস্ত্রে, বিজ্ঞানালোচনায়, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে, মানব জীবনের সকল বিভাগে ও সকল কার্য্যেই বিভিন্নরূপ গবেষণা, সিদ্ধান্ত ও মতের প্রভাব আবহমান কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের জাতীয় রাজনীতি বিষয়ে বিভিন্নরূপ চিন্তা ও মতের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? "টাইমস্", "পাইওনিয়ার" প্রমুখ ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌গণ অতিশয় নৈপুণ্য সহকারে নানা সুরে গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন :—

"মডারেটস আর এক্‌ষ্ট্রীমিষ্টস্ এই যে দুই দল,
ভেঙ্গে চু'র করে দেবে তোদের পলিটিকস্ সকল।"

এবং দয়া ও সহানুভূতি পরবশ হইয়া এই আশ্বাসপূর্ণ উপদেশে বাক্যে ক্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত ভারতীয় ভ্রাতাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন :—

"আন্দোলন আস্ফালনে নাহি কিছু ফল,
পেটার্ণাল গবর্ণমেন্টকে কর্‌বে সম্বল।"

আরও পরিতাপ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেক জ্ঞানবান ও বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসী ও ভারতবন্ধুর মুখস-পরিহিত এই প্রবঞ্চকদের মোহে দিক্‌হারা হইয়া, কখন কখন, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে, সোৎসাহে নৈরাশ্য ও কুৎসার প্রহসন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমাদের এই রাজনৈতিক আন্দোলনে দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির দলের সৃষ্টি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ নাই, বরং আনন্দিত

ও উৎসাহিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই জানেন যে, মানবের জ্ঞানানুশীলনের অসংখ্য বিভাগে ও জগতের অশেষবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিমত, বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন উপায়, বিভিন্ন প্রণালী উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হওয়ায় জ্ঞান-রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত ও পরিধি-বিস্তৃত হইয়াছে এবং কর্ম্মজগতের অশেষবিধ সমস্যা সহজ-সাধ্য হইয়াছে। বিজ্ঞান রাজ্যে নানারূপ বিরোধী মতের অবতারণা হইয়াছে, দর্শনশাস্ত্রে অগণ্য প্রকার সমস্যা ও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, ধর্ম্মজগতেও নানা প্রকার যুক্তি-সম্পন্ন নানা মুনির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু এই সকল কারণে বিজ্ঞানালোচনা, দর্শন শাস্ত্রাধ্যয়ন বা ধর্ম্ম-সমস্যা সমাধানের কোনও রূপ ব্যাঘাত না হইয়া, বরং নানা রূপ গবেষণা, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতে প্রত্যেকটীরই কাঠিন্য দূর ও মীমাংসাকরণ সহজ ও সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়ে নানা মতের (theory) অবতারণা হইয়াছিল বলিয়াই, ঐ সকল বিরোধী মতেরই নানা ভাবে বিশ্লেষণ, সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিৎ আধুনিক মত ও প্রণালী (the most modern principles and methods) আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করেন; দর্শন শাস্ত্রে নানা মতাবলম্বী চিন্তামার্গের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সকল চিন্তা ও মীমাংসার সারাংশ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান দার্শনিক সগর্ব্বে বলিতেছেন যে, তিনি সব চেয়ে সুযুক্তিপূর্ণ দার্শনিক প্রথা (the most rational system of philosopy) অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যেও নানা মতাবলম্বী মুনির আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়াই ঐ সকল জ্ঞানিগণের চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যেই এত শীঘ্র বর্ত্তমান ধর্ম্ম-ইতিহাসালোচক সমালোচনা-সিদ্ধ ধর্ম্মের (comparative religion) আশাপ্রদ সংবাদ সভ্যজগতে প্রচার করিতে পারিয়াছেন। রাজনৈতিক বিভাগেও, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রূপ চিন্তা, গবেষণা ও প্রস্তাবের সাহায্যে, মানবীয় অন্যান্য চিন্তনীয় বিষয়ের ন্যায়, রাজনৈতিক সমস্যাবলীরও সহজ-মীমাংসা হইবে। তবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেমন জগতের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিসংবাদী চিন্তামার্গ তিরোহিত হইয়া নূতন মার্গ ও প্রণালীর জন্ম হইয়াছে, তেমনি, রাজনৈতিক বিভাগেও কালের পরিপক্কতা ও মানবের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগরিত উন্নতির অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে, অনেকগুলি বিরোধী রাজনৈতিক শ্রেণী তিরোহিত হইয়া অতি অল্পসংখ্যক বা একটী সুদৃঢ়, সুসংস্কৃত, সুবিস্তৃত রাজনৈতিক আয়োজনের (political institution or orgnisation) সৃষ্টি হইবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ একীভূততা (integration or unification) আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ে সংসাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শুধু বিভিন্নতা দেখিয়া ভীত বা ভাবিত হইবার কোন কারণ নাই। আপাততঃ যাহা কিছু ভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন বা বিরোধভাব-যুক্ত, তাহা তাহাদেরই সাহায্যে পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত ও পরিশেষে একীভূত হইয়া যাইবে, কেননা জগতের গতিই মিলন ও একীভূতত্বের দিকে। (The law of unification or integration is sown already in the lawn of Disintegration) বিশ্বাস কর, আমাদের সংবিরোধী রাজনৈতিক-ক্ষেত্রেও এই সার্ব্বভৌমিক নিয়ম